বুভুক্ষু মানব

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

'বুভুক্ষু মানব'এর গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রবাসী, শনিবারের চিঠি, যুগান্তর, প্রভাতী ও শ্রীহর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। বন্ধু মণীন্দ্রের সাহায্যে গল্পগুলি সঙ্কলিত হইয়া গ্রন্থের আকারে বাহির হইল। তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

গল্পগুলির ভিতর 'মড়ার দেশ'কে উপলক্ষ করিয়া নানা আলোচনা হইয়াছে। যাঁহারা প্রতিকূল মত পোষণ করিয়াছেন এবং আমাকে জানাইতে দ্বিধান্বিত হন নাই, তাঁহাদের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ; কারণ, তাঁহাদের মূল মতের সহিত আমার অনৈক্য নাই। তাঁহারা আমার প্রতি কঠোরোক্তি প্রয়োগ করিয়া পরোক্ষভাবে আমার ব্যক্তব্যের প্রকাশভঙ্গীকে প্রশংসা করিয়াছেন; আমার লেখা সার্থক হইয়াছে।

গল্পটি বাস্তবিকই বীভৎস রসের প্রকাশ, যাহা সত্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল।

এই সূত্রে আত্মরক্ষার নিমিত্ত দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি: রসরাজ্যে কেবল মোহন রূপের প্রকাশ ও নীতি-রক্ষণ, রূপস্রষ্টার চরম আদর্শ নয়। করুণ, ভয়ঙ্কর এবং আদিরসও নিজস্ব বিশিষ্টতায় পূর্ণ। কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া Hugo, Allen Poe Voltair ও বৈষ্ণব সাহিত্যে স্বতন্ত্রভাবে উক্ত রস প্রকাশের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সাহিত্য বাদ দিলেও, ধর্ম্ম সংক্রান্তে আমাদের দেবদেবীর কল্পনায় পাই—তাণ্ডব-নৃত্য-রত মহাদেবের ধ্বংসকারী ভয়াল রূপ, শক্তির উপাসনায় নরমুণ্ডমালিনী মহাকালী দিগম্বরারূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন, রতিপতি কামের দেবতায় লালসা মিশ্রিত আদিরসের দিকও বাদ পড়ে নাই। ভয়ঙ্কর ও কামরূপের কল্পনা ভক্তিরাজ্যে অবাঞ্ছনীয় না হইলে, বীভৎসেরও একটি স্থান আছে—যাহা উদার রসগ্রাহী অস্বীকার করিতে পারেন না।

সুন্দরের রূপ সর্ব্বব্যাপী, কোন বিশেষ আদর্শে তাহার সত্তা সঙ্কুচিত নহে। ব্যক্তিগত রুচি ধরিলে তাহা রসগ্রহীতার মনোবৃত্তির উপর ইঙ্গিত করিয়া থাকে। এই মনোবৃত্তি অধিকাংশ স্থলে সংস্কারবদ্ধ; শিক্ষা ও সামাজিক প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত; সুতরাং ভিন্ন মত সমর্থন অধিকাংশ স্থলেই অসম্ভব। যাহা প্রকাশ্য তাহার বিষয়বস্তু অন্ধবিশ্বাসে স্থাপিত নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিলে ব্যক্তিবিশেষকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে এবং যদি উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহা করিয়া থাকে তো লেখক বাস্তবিক দুঃখিত। দুঃখিত হইলেও বলিব, এইরূপ বিষয়বস্তুকে আদর্শ করিয়া আর্টের বিচার বাঞ্ছনীয় নহে। বিষয়বস্তু ঠিক গৌণ না হইলেও, যে কোন রূপকেই আর্টের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যদি রসস্রষ্টার আন্তরিক প্রেরণা ও প্রকাশশক্তির অভাব না থাকে। এ বিষয়ে অনেক লিখিবার আছে—তবে প্রবন্ধ লিখিতে বসি নাই, সেই কারণে বিরত হইলাম।

গ্রন্থকার

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার

করকমলেষু—

বুভুক্ষু মানব

অমানিশার ঘোর অন্ধকার এবং ভয়াবহ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া নারীকণ্ঠের করুণ আর্তনাদ উঠিল, 'দ্বার খোল'। ধ্বংসোন্মুখ জীর্ণ অট্টালিকা, তাহারই দ্বারপার্শ্বে একটি ক্ষীণকায়া নারী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দেহের সমভার বহনে অক্ষম, পা টলিতেছে, কোন প্রকারে দেওয়ালে ঠেস দিয়া নারী ব্যাকুল ভাবে দ্বার উন্মোচনের আবেদন জানাইল। রুদ্ধ কবাট খুলিল না। ভিতর হইতে কোন মানুষের নাভিশ্বাসের ন্যায় শেষ-নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছিল—একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান রাখিয়া শ্লেষ্মাজড়িত ঘড় ঘড় ধ্বনি। শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল। মৃত্যুর বার্তা সুনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ বাদে শব্দ থামিয়া গেল। নারীর দৃশ্যপটে সূচিভেদ্য অন্ধকার ব্যতীত আর কিছু নাই—আবেষ্টনী যেন মুহূর্তে প্রেতলোকে পরিণত হইয়া গেল। মহান্ধকারের অতল গহ্বর হইতে আর এক অন্তর্ভেদী বাণী উঠিতেছিল, মৃতের নিমিত্ত নির্বাক্ শোকোচ্ছ্বাস। নারী আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, সংজ্ঞাহীনার ন্যায় চৌকাঠের উপর গিয়া পড়িল।

ঘটনাস্থলটি গৌরপুর গ্রামের বাবুদের বাড়ি। এখানে কয়েক মাস আগেও প্রাচীন বংশের আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিয়াছিল কিন্তু শেষরক্ষা হইল না। অকস্মাৎ অন্নাভাব মহামারীর ন্যায় গ্রামবাসীদের আক্রমণ করিল। লোকেরা দিশাহারা হইয়া দিকে দিকে ভিটার মায়া ছাড়িয়া পলাইয়াছে। সকলের মুখে একই কথা—অন্ন কোথায়? যাহারা ভিটার মায়া ছাড়িতে পারিল না তাহাদের ভিতর অনেকে দিনে দিনে শুকাইয়া মরিল, যাহারা মরিল না তাহারা মৃত্যুর অপেক্ষায় রহিয়া গেল। চতুর্দ্দিকে মৃতের দেহ। তাহাদের দাহনক্রিয়া হয় নাই, গলিত মাংসের পূতিগন্ধে বায়ু বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রামের ছোটবড় কুটিরগুলি অধিকাংশই পরিত্যক্ত, কোনটির কবাট খোলা,—ভিতর খাঁ-খাঁ করিতেছে। কোনটির কুলুপ ভাঙা—দুর্বৃত্ত মরিবার আগেও অপহরণের লোভ কাটাইতে পারে নাই, কিংবা হইতে পারে অপাক অন্নের সন্ধানেই বলপ্রয়োগে পর-গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। চাটুয্যেদের ঐ আটচালায় ভাগাড়ের ন্যায় অস্থির ভিড় লাগিয়াছে, সব নরকঙ্কাল। ওলাউঠা একটির পর একটি মানুষকে মারিয়া বংশে পিণ্ডদানের নিমিত্ত কাহাকেও রাখে নাই। ঐযে রামু মুদির দোকান—যেখানে লাউলতার শুক্‌না কয়টা মোটা ডাল পড়িয়া আছে, ঐখানে ছিল রামুর তুলসীতলা। নিকটেই স্বহস্তে বীজ পুতিয়াছিল গাছটাকে নজরে রাখিবার জন্য। পুষ্ট কাণ্ড লইয়া যে-দিন লতা ফলেফুলে

কুটিরের ছাউনি সব ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, সে-দিন রামু আনন্দ ও স্বত্বাধিকারীর গর্ব্বে বলিয়াছিল—'আঃ বাবা, যে-ভাবে বেড়ে চলেছে কোন্‌দিন ওর ওজনে চালসুদ্ধ ভেঙে পড়বে।' চালা ভাঙে নাই,
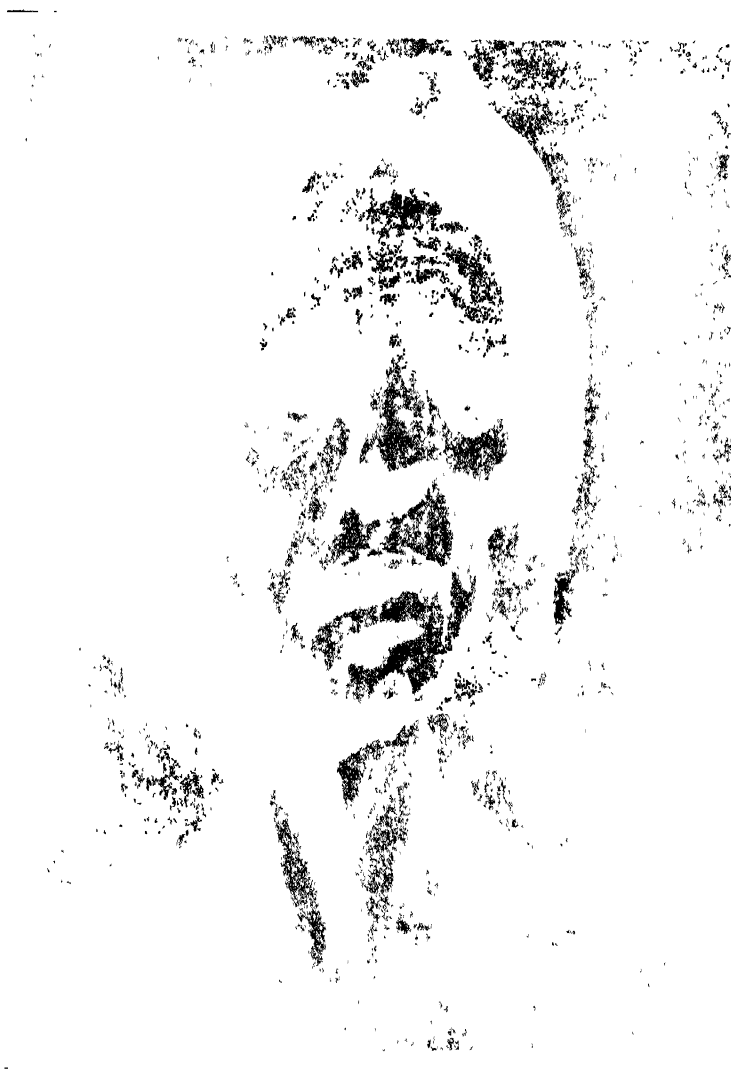
রামু মরিয়াছে। গাছের গোড়া পর্য্যন্ত মানুষ কাঁচা অবস্থাতেই চিবাইয়া খাইয়াছে। বাবুদের বাঁধান বড় পাতকুয়ায় কিসের শব্দ? ভিতরে মানুষকে ভাসিতে দেখা যায় না? সত্যই দুইটি প্রাণী ডুবিয়া

মরিয়াছে, কানের পাশ দিয়া ছোট ছোট বুদ্বুদ বাহির হইতেছে. বৃষ্টির বড ফোঁটার শব্দের মত তাহার আওয়াজ যাহার প্রতিধ্বনি ফাঁপা মৃৎ-গহ্বর হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া আসিতেছে। মানুষ একটি নয়, দুইটি। একটি শিশু, অপরটি নারী। উভয়েই উপুড় হইয়া আছে,—মাথার পিছন দিকটা ও কোমরের খানিকটা জলের উপর দেখা যায়। সামান্য হাওয়া ভিতরে ঢুকিলে গোলাকার বৃত্তের ভিতর ঘুরিতে থাকে ; হাওয়ায় নারীর এলোকেশ অসংখ্য ছোট সাপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া নড়ে। শিশুর অনশন মাতা হয়তো সহ্য করিতে পারে নাই, সন্তানকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া নিজে তাহার পথানুসরণ করিয়াছে। পাতকূয়ার উপরে আরও একটি শব, কঙ্কালসার পুরুষের। অধিককাল মরে নাই,—দড়িবাঁধা ঘটিটা হাতে ধরা রহিয়াছে। লোকটা নিশ্চয় জল খাইয়া জঠরাগ্নি নিভাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কূপ হইতে জল তুলিতে না পারিলেও জলপাত্রটিকে ছাড়ে নাই—এইরূপ দৃশ্য একটির পর একটি অতিক্রম করিলে পুনরায় বাবুদের সডকে আসিয়া পড়া যায়। সড়ক পার হইলেই তোরণদ্বার, নবাবী আমলের তৈরী। এখান হইতে খানিকটা দূরে সেই রুদ্ধ কবাট, যেখানে নারী শোকে সংজ্ঞাহীন হইয়া বসিয়া পডিয়াছিল।

বলিতেছিলাম বাবুদের কথা, রুদ্রনারায়ণ চৌধুরীর কথা। আভিজাত্যের পূর্ণ প্রকোপ যখন রুদ্রনারায়ণকে ধীরে ধীরে দৈন্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ব্যবস্থা করিতেছিল, যখন রুদ্রনারায়ণ এক তৌজী গোপনে বেচিয়া অপর তৌজীর প্রজার অন্ন সরবরাহ করিতেছিলেন, যখন চৌধুরী-বাড়ীর বৌ-রাণী মহালক্ষ্মীর জড়োয়া গহনা প্রায় পিতল কাঁসার দরে বিক্রী হইতেছিল, সেই সময় এই মহামারী ব্যাপক ভাবে গ্রামকে আসিয়া গ্রাস করিল। দানবীর রুদ্রনারায়ণ বেশীদিন প্রকৃতিগত ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার অবসর পাইলেন না। তাঁহার নিজের পুরাতন কর্ম্মচারীরাই অন্নাভাবে প্রজাদের ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল, দানের অপেক্ষায় কেহ থাকিল না। সবকিছুই লুট হইতে লাগিল। মহালক্ষ্মী প্রাচীনপন্থী জমিদার-বংশের ঘরণী হইলেও প্রজাদের সামনে বাহির হইতেন। সকলে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিত। অভিমানী স্বামীর তরফ লইয়া মহালক্ষ্মী প্রজাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 'ক্ষণ তিষ্ঠ', কিন্তু ফল পান নাই। সহস্র প্রাণীর হাহাকারে প্রাঙ্গণ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল—অন্ন দাও, বুভুক্ষু মানব আমরা, অন্ন দাও। মানুষের জঠরাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ নাই। দেখিতে দেখিতে গ্রামে বাজার হাট উঠিয়া গেল, কতক লুটের ভয়ে, কতক মাল সরবরাহের অভাবে। গ্রাম অল্প সময়ের ভিতর মৃতের আবাসভূমিতে পরিণত হইল। যেটুকু আহারের সংস্থান মহালক্ষ্মী করিয়াছিলেন, তাহাও নিয়মিত ব্যয়ে নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছিল। স্বামীকে তিনি চিনিতেন তথাপি একমাত্র সন্তানের দিকে তাকাইয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, 'একবার সাহেবসুবোদের সঙ্গে দেখা কর না, হয়ত একটা কিছু ব্যবস্থা হ'তে পারে।' রুদ্রনারায়ণের

বংশমর্য্যাদা এবং আত্মাভিমানের নিকট সবকিছুই তুচ্ছ। যেখানে হৃদয়ের সম্বন্ধ নাই, সেখানে দয়ার উপর নির্ভর করিয়া বাঁচা অপেক্ষা মৃত্যু তাঁহার নিকট অধিকতর বরণীয়। স্বল্পভাষী দানবীর বলিয়াছিলেন 'ভেবে দেখি।' তাঁহার ভাবনার অন্ত ছিল না, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না।

ঘটনার ঘূর্ণ্যমান চক্র দারুণ বেগে ঘুরিতেছিল। সঞ্চিত অন্ন নিঃশেষিত হইতে হইতে এমন একটি সময় আসিল যখন একবেলা অর্দ্ধাহারের বেশী জীবনধারণের জন্য অন্ন সংস্থান থাকিল না! রুদ্রনারায়ণ উহা হইতেও পুত্র ও স্ত্রীকে ভাগ দিতেছিলেন। মহালক্ষ্মীর প্রতিবাদ নিষ্ফল হইয়াছিল। রুদ্রনারায়ণের মত পরিবর্ত্তন যে অসাধ্য কর্ম্ম তাহা তিনি জানিতেন।

সে-দিন ময়না চাকরটা আর ফিরিল না। পুরাতন ভৃত্যদের ভিতর ময়নাই টিকিয়াছিল, সেও চলিয়া গেল। যে-দিন ময়না বাবুদের বাড়ী ছাড়িয়া গেল সেই দিনই পুত্রের সংক্রামক রোগের লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। নধর ননীর পুতুল শুকাইয়া জীর্ণ কঙ্কাল হইয়া গিয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে তৃষ্ণায় 'জল জল' করিয়া উঠিতেছে। ঘরে একটি মাত্র জলপাত্র তাহাও শূন্য, এখন বাহির হইতে জল না আনিলে উপায় নাই। মহালক্ষ্মী উঠিতে পারেন না, অসুস্থ শিশু ক্রোড়ের উপর রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। মহালক্ষ্মী দৃষ্টির দ্বারা স্বামীকে জল আনিতে অনুরোধ করিলেন।

বাহিরে পাতকুয়া হইতে চৌধুরী-বাড়ীর কোন কর্ত্তা জল তোলে নাই। উহা ভাবিতে ক্ষণিকের জন্য ইতস্ততঃ ভাব আসিয়াছিল কিন্তু পরক্ষণেই পুত্রের করুণ প্রার্থনা শুনিয়া চাঁদির ঘটী লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরেই জলপাত্র পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু পুত্রকে তাহা পান করাইতে দ্বিধান্বিত হইতেছিলেন। জল দূষিত। ঐ পাতকুয়াতেই দুইটি মানুষের মৃতদেহ দেখিয়া আসিয়াছেন। জলপাত্র হস্তে তিনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া মহালক্ষ্মী পাত্রটি গ্রহণের নিমিত্ত হাত বাড়াইলেন। রুদ্রনারায়ণের মুখাকৃতিতে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—দয়ার অবতার কঠোর হইয়া গিয়াছেন, দেহে যেন রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়াছে; পাষাণবৎ অটল ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। যে-মানুষ ভগবানকে দয়াল প্রভু ভাবিয়া একনিষ্ঠায় সারাটা জীবন পূজা করিয়াছেন, যে-মানুষ দান না করিয়া নিজে অন্নগ্রহণ করিতেন না, তিনি আজ ইষ্টদেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছেন, মানুষের সদ্‌গুণকে দুর্ব্বলতা ভাবিতেছেন। কয়েক মুহূর্ত্তের ভিতর নানা চিন্তাই তাঁহাকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত কম্পিত হস্তে বীজাণুর বিষমিশ্রিত জল স্ত্রীর হাতে তুলিয়া দিলেন। পুত্র আগ্রহে তাহা গলাধঃকরণ করিল। রুদ্রনারায়ণ পুত্রের মৃত্যুর অপেক্ষায় অটল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন তিনি

ভাবিতেছেন—চিকিৎসার আশা নাই, কোনপ্রকারে রোগমুক্ত হইলেও অন্নাভাবে তিলে তিলে শুকাইয়া মরিবে। এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখা অপেক্ষা মৃত্যুর দ্বার বিস্তারিত করিয়া দেওয়া ভাল। জল সেবনের পর পিতা পুত্রের মুখশ্রীকে অপলক দৃষ্টির দ্বারা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পলে পলে সময় কাটিতেছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে নির্ব্বাক্। ঘরে খানিকটা অংশে ক্ষীণ জ্যোৎস্নার আলো আসিয়াছে। ভিতরের দিকে গাঢ় অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। কারণ দীপাধার তৈলশূন্য। যেটুক প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইতেছিল তাহা থাকিয়া থাকিয়া কচি গলার হেঁচ্‌কি।

গভীর রাত্রে কঙ্কালসার শিশু বাঁচার যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ধীরে ধীরে মাতার ক্রোড়ে অসাড় ও কঠিন হইতে লাগিল। শোকবিহ্বলা মাতা ভাবিতে পারিতেছিলেন না, মা বলিয়া ডাকার প্রধান অধিকারী তাঁহাকে সর্ব্বহারা করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মৃত সন্তানকে বুকের মাঝে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, যে নাই তাহাকেই পাওয়ার সান্ত্বনায়।

রুদ্রনারায়ণ সত্যই পাষাণ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার চক্ষে এক ফোঁটা জল নাই। হয়ত অশ্রুধারা অদৃশ্যভাবে অন্তরে বহিতেছিল। স্ত্রীকে স্থির ও দৃঢ়ভাবে বলিলেন, 'আর কাঁদিয়া লাভ নাই, এখন আমাকে দাও আমার শেষ কর্ত্তব্য সারিয়া আসি।'

পুত্রের দাহক্রিয়া শেষ করিয়া রুদ্রনারায়ণ নিজের সমস্ত সহ্যশক্তি ও ক্ষমতা নিঃশেষ করিয়া শেষশয্যা গ্রহণ করিলেন।

পরের দিনের ঘটনা প্রথমেই বলিয়াছি। দ্বারপার্শ্বে যে-নারী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তিনি মহালক্ষ্মী। স্বামীর জন্য চৌধুরীবংশের গৃহলক্ষ্মী পথের অসহায় ভিখারিণীর মত ডাক্তারের দ্বারস্থ হইয়া সামান্য ঔষধ-পথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। জনসেবায় নিযুক্ত ডাক্তার দয়াপরবশ হইয়া আহার ও ঔষধ দিয়াছিলেন। মহালক্ষ্মী মানমর্য্যাদার বিনিময়ে যাহা সংগ্রহ করিলেন তাহাই গ্রহণের অসম্ভবতা রুদ্রনারায়ণ মরিয়া জানাইয়া দিলেন।

ছোরা

ইরাণ দেশের বেদেনী—ধারালো ছোরা বুকের সামনে ঝুলাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ফিরি-করা তাহার জীবিকা; ছুরি—কাঁচি—ছোরা মূলধন। ছুরি সে বেচে, ছোরা সে মারে মানুষের বুকে। প্রথমটি পেশা, পরেরটি নেশা। রূপে তাহার আগুন আছে—সব সময় তাহা জ্বলে। সোজা কথায় বেদেনীর সান্নিধ্য মারাত্মক। মারাত্মক তাহার রূপ, অধিকতর মারাত্মক তাহার বয়স। কাঁচা নয়, পাকা নয়...... একেবারে যৌবনে ঠাসা।

বেদেনী মাথায় বাঁধিয়াছে রেশমী রুমাল, গায়ে পরিয়াছে হাল্‌কা রংএর পাঞ্জাবী। কটিদেশে দোলায়মান চাম্‌ড়ার বড় থলি....পিতলের পাতে মোড়া। পাতের উপর ছাপ পড়িয়াছে কারুশিল্পের দক্ষতা।....ভিতরে আছে আরো ছোরা—আরো ছুরি। বোতাম পরিবার ব্যবস্থা পীনোন্নত স্তনদ্বয়ের মধ্য দিয়া। কিন্তু বোতামের ঘরগুলি সব খালি, কারণ বেদেনী কখনও বোতাম লাগায় না। লোভীর দল জিনিষ কিনিবার ছলে দম্‌কা হাওয়ার অপেক্ষায় থাকে যদি আড়াল সরিয়া যায়। আড়াল অপসারিত হয় বৈকি....দম্‌কা হাওয়াতেও সরে, ইচ্ছাকৃতও সরে। পরেরটির জন্য উপযুক্ত ক্রেতা অথবা দর্শকের প্রয়োজন হয়। বেদেনীর ভাগ্যে তাহা কদাচিৎ জোটে।....কোর্ত্তা যখন সরে তখন দেখা যায় মাংসচুড়ার সন্ধিস্থলে অবর্ণনীয় দুইটি ঘনীভূত চক্রাকার রেখা একের গায়ে অপরটি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। রেখার সামান্য উৰ্দ্ধেই বিচিত্র রংএর সমাবেশ—একটুখানি লাল, একটু পাতলা সবুজ, তাহাই সংমিশ্রিত হইয়াছে ধোলাই করা স্বচ্ছ পীতের সহিত। যেন বৃষ্টির পর রৌদ্রচ্ছটায় রামধনুর আবির্ভাব! সুবিধা থাকিলেও সেদিকে বেশীক্ষণ সহজ দৃষ্টি নিক্ষেপের উপায় নাই চোখ ঝলসিয়া যায়—চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে—অন্তরে লাগে বৈদ্যুতিক ঝাঁকুনি। সে ঝাঁকুনি সহ্য করিতে পারে কয়জন?

বেদেনী দলের ভিতর একটু কেমনতর। সরকারী আইন তো দূরের কথা, নিজের সমাজের আইনও সে মানে না। ভবঘুরের সমাজে বেদেনী বিবাহিতা। কিন্তু তাহার মরদকে সে বাতিল করিয়া দিয়াছে। সাহস করিয়া কেহ কৈফিয়ৎ চাহিলে বলে—'উয়ো ক্যা মরদ্ হ্যায়, উয়ো তো চিড়েই।" চিড়েই শব্দটির পিছনে একটি তীব্র জ্বালাময় ইতিহাস আছে। সে নিজের দলেই একটি মনের মত মরদ্ পাইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে সে নিজের করিয়া ভোগ করিতে পায় নাই—মরদ তাহার বৌকে ভালবাসিত বলিয়া।—অন্তর্জ্বালায় এখন সে সকলকেই চিড়েই বলে। তাহার মতে যে মরদ একের অধিক স্ত্রীকে ভোগ করিতে পারে না সে চিড়েই। চিড়েই শব্দটি যখন উচ্চারণ করে তখন

সে সোজা হইয়া দাঁড়ায়। স্ফীত কঠিন বক্ষ ফাটিয়া যেন দেহ হইতে ঠিক্‌রাইয়া আসিতে চায়। বামহস্ত কটির উপর রাখিলে গ্রীবা ঈষৎ বঙ্কিম ভাব ধারণ করে, তাহার পর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া এমন একটি রহস্যময় ও ভীতিপ্রদ কটাক্ষ হানিয়া বসে, যাহা বিপদের নিমন্ত্রণ-সঙ্কেত। সঙ্কেতটি এমনই নির্দ্দিষ্ট যে বেদেনীর দলভুক্তরাও তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। কারণ বেদেনীর উত্তেজনা সীমাবদ্ধ নয়—সামান্য মতভেদেই ছোরা বসাইয়া দেয়। যৌবন তাহার দুর্দ্দান্ত....খুন তাহার গরম। সে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীকে শেষ করিয়া দিবে না তো কি অহিংসার পাঠ আবৃত্তি করিতে থাকিবে?

সেদিন বেদেনী দল হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটি অস্ত্রও বিক্রয় করিতে পারে নাই। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। সেই কারণে মেজাজটাও বিগ্‌ড়াইয়া আছে।....বড রাস্তা ছাড়িয়া একটি সঙ্কীর্ণ অখ্যাত গলিতে ঢুকিয়া পড়িল।.... দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতাপ যৎসামান্য স্তিমিত হইলেও গলিটি এখনো ঝিমাইতেছে। ঝল্‌সান পিচের রাস্তায় পথিক বড একটা দেখা যায় না। বাসনআলার কাংস্যধ্বনি দূরে মিলাইয়া গিয়াছে অথবা সে কোন গৃহস্থের শীতল রোয়াকে বসিয়া পড়িয়াছে।....বেদেনী মোড় ফিরিতেই দেখিল জলের কল। কিন্তু তাহা বেওয়ারিশ্‌ নহে। একটি পাগড়ী-পরা পাঞ্জাবী অতি বৃহৎ কলস পূর্ণ করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে....মুখ তাহার বিপরীত দিকে। কলে সবে তখন জল আসিতেছে।....কলস পূর্ণ হইতেছে ফোঁটার পর ফোঁটায়। বেদেনী পিছন হইতে আদেশ করিল, "হঠো....পানি পিউঙ্গি।" পাঞ্জাবীর মোছ্‌ ও গঠন বিলকুল পাঠ্ঠার মত। হঠো বলিলেই কি তাহাকে হটানো যায়? নীচু দিকে মুখ আনিতে দেখিল পার্শ্বে মোটা ময়লা ঘাগ্‌রা। ঘাগ্‌রার স্বত্বাধিকারিণী কিরূপ দেখিতে না জানিলে আদেশ মানা পাঞ্জাবীর পক্ষে অপমানকর বশ্যতা স্বীকার। কলস তখন তৃতীয়াংশের এক অংশও ভরে নাই। সে সরিবে কেন? ইহা রাস্তার জল। সরকার জল সরবরাহ করিয়া থাকে, তাহার দাবী কাহারও অপেক্ষা কম নয়। পাঞ্জাবী নড়িল না, কলের বণ্ট, টিপিয়াই রহিল। কলিকাতার তিনটা পাঁচের জল....ঝির ঝির করিয়া ক্ষীণভাবে ঝরিতেছে। তৃষ্ণায় বেদেনীর তালু শুকাইয়া গিয়াছে। তাহার পক্ষে পূর্ণ কুম্ভ দেখিবার ধৈর্য্য থাকিল না। বাস্তবিকই পাঞ্জাবীর শিরদাঁড়ায় ঠেলা মারিয়া আবার বলিল—'হঠো....পানি পিউঙ্গি।' অপরিচিতার নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত আচরণে পাঞ্জাবীর অহমিকা ক্ষুণ্ন হইল। উগ্র ভাষায় উত্তর করিল...."চল্‌ চল্‌রে ইয়ার, দুসরি কল দেখ লে।" হাতের ছোঁয়ায় নারীর নরম স্পর্শানুভূতি না থাকিলে ঘটনাটি নিশ্চয় অন্য রকম দাঁড়াইত।

তৃষ্ণার্থীর সামনে জল রহিয়াছে, তথাপি পানে বিঘ্ন ঘটিলে যে কোন মানুষের মানসিক অবস্থা

কিরূপ হইতে পারে সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বেদেনীর মন যেভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা নিরীহ ব্যক্তির বোধগম্যের বাহিরে। সে বুক হইতে ছোরা তুলিয়া আঘাত করিতে উদ্যত হইল। পাঞ্জাবী নারীকে দেখে নাই, কিন্তু অপরাহ্ণের চলন্ত ছায়ার গতিবিধি লক্ষ্য করে নাই তাহা নয়। কলহের পূর্ব্বক্ষণে সতর্কতা অবলম্বন—তাহার পেশা এবং স্বভাব। অস্ত্রসহ উর্দ্ধে উত্তোলিত বাহুর ছায়ার লক্ষ্য তাহারই পৃষ্ঠদেশ বুঝিয়া পাঞ্জাবী চকিতে মাটিতে বসিয়া পড়িল। বেদেনী নিজ দেহের গতিবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া পাঞ্জাবীর দেহে পা লাগিতেই তাহার পিঠের উপর উবু হইয়া পড়িয়া গেল। এই ঘটনার পর একটি মুহূর্ত্ত সময় অতিবাহিত হয় নাই, দেখা গেল বেদেনী পাঞ্জাবীর পিঠের উপর অসহায় অবস্থায় শিশুর মত ঝুলিতেছে।

কলের সামনেই পাঞ্জাবীর ভাড়া-করা বাসা। দরজা একটি অচল ট্যাক্সি আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। পাঞ্জাবী জল ভরিতেছিল মোটর চালাইবার জন্য।...পাঞ্জাবীর পেশা নানা প্রকারের। প্রথম নম্বর সে ট্যাক্সি চালক,—দ্বিতীয় নম্বর কুস্তিগীর,....তৃতীয়টি অনবরত বিবাহ করা। বিবাহ ও খাদ্যের ব্যাপারে সে কোন ধর্ম্মই মানে না। জবরদস্তি অনুকূল মুক্তি আনিতে সে ওস্তাদ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় নম্বর সম্বন্ধে সে যশ অর্জ্জন করিয়াছে। বাসা বাড়ীটার কিয়দংশ ইটের গাঁথুনি, চালাটা খোলার। তিনটি পূরা ঘর, একটি ক্ষুদ্র মেটে উঠান ও দেড় হাত চওড়া রাস্তার ধারে সিমেণ্ট বাঁধান রোয়াক। এতগুলি সুব্যবস্থার খরচ সে একাই বহন করিয়া থাকে। পালোয়ান জয়লব্ধ জীবন্ত নারীকে উঠানের নিকট আনিয়া জোরে আছাড় মারিয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদেনীকে নিরস্ত্র করিয়া ফেলিল। ছোরা ও ছুরি অপসারিত হইলেও বেদেনীর নিকট অধিকতর অব্যর্থ ও মারাত্মক অস্ত্র ছিল। উহা স্বামীর স্কন্ধে চড়িয়া গৃহ প্রবেশের সময় তিনটি স্ত্রীই লক্ষ্য করিয়াছে। সে সুন্দরী, তাহার উপর তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইবার মত বয়স সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। এই কারণে নবাগতাকে তাহারা হিংসার চোখেই দেখিল। বয়সের প্রভাবে পালোয়ানকে অনেক সময় কাবু হইতে দেখা গিয়াছে। মাটিতে পড়ার পর যে সময় বেদেনী পরিচ্ছদ সংযত করিতেছিল, উহারই ভিতর জহুরী জহর আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। পালোয়ান দেখিল ইরাণী সুন্দরী—আগুনের ফুল্‌কী লইয়া তাহার কারবার। এই রকমটিই সে খুঁজিতেছিল, সুতরাং ছাড়া নয়।

নিজের স্কন্ধ হইতে রক্ত ঝরিতেছে দেখিয়া পেয়ারের ছোট বউকে জল আনিতে বলিল। ইরাণী যে সময় ঘাড়ের উপর পড়িয়াছিল, সে সময় ছোরাটার আঁচড় লাগিয়া কিভাবে খানিকটা কাটিয়া গিয়াছিল। ক্ষত গভীর হয় নাই, কিন্তু রক্তের আবির্ভাবে পালোয়ানের সঙ্কল্প দৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল।

জল আসিলে পালোয়ান ক্ষত স্থানটি পরিষ্কার করিল না। জলপূর্ণ পাত্রটি লইয়া চলিল ইরাণীর দিকে—উদ্দেশ্য করুণা প্রকাশ, তৃষ্ণার্থীকে জল দান।

বেদেনীর স্বভাব কতকটা সর্পিণীর মত। কাহাকেও সে বিশ্বাস করিতে পারে না। প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনের অজুহাত তাহার নিকট নাই—ক্রুদ্ধা হইলেই বিষাক্ত ছোবল বসাইয়া দেয়। ক্রোধ তাহার কেন আসে, সে নিজেই জানে না। পালোয়ান তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া বেদেনী 'হস্ হস্' শব্দ করিয়া উঠিল হুবহু নাগিনীর দংশনোন্মুখ রোষমিশ্রিত গর্জ্জনের মত। পালোয়ান পিছাইয়া আসিল, ভাবিল এখন হয়তো দেহের কোন অংশে ছোরা লুক্কায়িত রহিয়াছে। বেদেনীও ভাবিল লোকটা হয়ত আবার তাহাকে আছাড় মারিতে আসিতেছে।....তুলনায় উভয়ের দেহ-গঠনের পার্থক্য এত বেশী যে, পালোয়ান ইচ্ছা করিলে বেদেনীর মত একটি নারীকে লুফিয়া লুফিয়া লাড্ডু খেলিতে পারে। বেদেনীর ইতিমধ্যে ভয়ের সহিত ভিন্ন মনোভাবও আসিয়া পড়িয়াছিল। জীবনে কোন পুরুষ কখন তাহাকে দমাইয়া দেয় নাই। সারাটা যৌবনই সে পুরুষকে অবজ্ঞা করিয়াছে, কৃপার পাত্র ভাবিয়াছে। কিন্তু আজ সে পুরুষের নিকটই কৃপার্থী। নত হইবার জন্য অন্তরে সে প্রায় প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিল। পালোয়ানকে ভাল লাগিতেছিল....মরদ বটে। কিন্তু ভাল লাগিলে কি হয়, বিশ্বাস করাটা তাহার নিকট স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। গোক্ষুরা নাগিনী ঘরের ভিতর কোণঠাসা হইলে যেভাবে সর্ব্বদিক সন্দিগ্ধ ও সন্ত্রস্তভাবে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, ঠিক সেইভাবে বেদেনী উন্নত বক্ষকে ফণার মত বিস্তারিত করিয়া কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত দুলাইতে লাগিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা আততায়ীদের দেখিয়া লইল। প্রথমেই চোখে পড়িল তিনটি স্ত্রীলোক—ঘুন ধরা....একেবারে বাজে। দরদযুক্ত দানের সময় গ্রহীতা দাতাকে শত্রু ভাবিলে এমন কোন দানবীর নাই যে, উক্ত ব্যবহার সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে।....পালোয়ান জল লইয়া যাইতেছিল ইরাণীর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ; কিন্তু প্রতিদান যাহা পাইল তাহা কঠোর চাহনী এবং রোষমিশ্রিত গর্জ্জন। পালোয়ানও মাতৃভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিয়া রুখিয়া উঠিল। বধূত্রয় সাপের খেলা দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া গেল। ইরাণী যদি সর্পিণী হয় তো পালোয়ানও ... সাপুড়ে। কত নাগিনী সে ধরিয়াছে অন্ত নাই। ধরা সাপ বশ করিয়াছে, পোষ মানাইয়াছে....পুনরায় ছাড়িয়া দিয়াছে নতুনের আমদানীর জন্য।

বেদেনীর ছোবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য ওস্তাদ কোন্ প্যাঁচ খেলিবে দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক ও ভীতভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। একটি বাদে অপর দুইটি ধর-পাকড়ের ভিতর দিয়াই পালোয়ানের গৃহে গৃহিণী হইয়াছে। তাহারা জানিত ওস্তাদ এমন একটি চিজ্‌কে পোষ না মানাইয়া ছাড়িবে না।....

....সাপুড়ে দুধকলা দিয়া সাপ পুষিলে কি হয়, তাহার জীবিকা উপার্জ্জন নির্ভর করে সাপের ছোবল দেখাইয়া। সাপ কখন পোষ মানে না ইহা যে স্বতঃসিদ্ধ, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য সারাটা জীবন সে সাপ খেলাইয়া বেড়ায়।....উপস্থিত ক্ষেত্রে পালোয়ান সাপুড়ে, বেদেনী সর্পিণী.... এখনো ঝাঁপির বাহিরে রহিয়াছে—গল্প আমাদের সুরু হইল।....

পালোয়ানের প্রেম-নিবেদনে কোন ভ্যাজাল নাই। ইরাণী জল প্রত্যাখ্যান করায় পুরুষ মর্ম্মে আহত হইয়াছিল। সুতরাং পানীয় জলেই পা ধুইয়া ফেলিল। তৃষ্ণার্ত্তীর সম্মুখে জলের এইরূপ অপব্যবহার দেখিয়া ইরাণী দাঁড়াইয়া উঠিল এবং যে জল আনিয়াছিল তাহারই উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য কনিষ্ঠা বধূর দিকে অগ্রসর হইল।....সুন্দরী কুপিতা হইয়াছে—অপরূপ দৃশ্য। পাতলা ঠোঁট দুইটি সাপের জিহ্বার মতই নড়িতেছে ...লক্ লক্ করিতেছে। বক্ষ প্রায় অনাবৃত—রোষান্ধের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। গোলাপী গণ্ড রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়াছে; মাথার বাহারী রুমাল খসিয়া গিয়াছে....ইরাণী কনিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য।....

....পেয়ারের বধূর নিকট আসিতেই পালোয়ান ক্ষিপ্রতার সহিত ইরাণীর হাত ধরিয়া ফেলিল, তাহার পর বক্ষের উপর নিজের হাত রাখিয়া একটি সহজ লেঙ্গীর দ্বারা মাটিতে ফেলিয়া দিল। পরক্ষণেই নারীদেহ-স্পর্শের প্রেরণা তাহাকে কামোন্মত্ত করিয়া তুলিল।....

সকলেই ভাবিয়াছিল পালোয়ান এইখানেই বোধ হয় থামিয়া যাইবে। কিন্তু ঘটিল অন্যরূপ। সাপখেলার শেষ হইতে এখনো বাকী আছে।....পালোয়ান ইরাণীর পিছনে গিয়া এমন কুস্তীর প্যাঁচেই তাহাকে ধরিল যাহাতে ইরাণীর পূর্ণাকার দেহ ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হইয়া গেল। এইভাবে পালোয়ান তাহাকে উঠান হইতে টানিয়া কনিষ্ঠার ঘরে লইয়া গেল। তাহার পর দরজা বন্ধ করিয়া দিল।....দরজা বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রহারের শব্দ আসিতে লাগিল।....

প্রথমা বহুদিন স্বামীর নিকট প্রহার পায় নাই। এই কারণে চোখে তাহার জল আসিয়া গিয়াছে। এককালে তাহার যৌবনশ্রীতে মাদকতা ছিল। তখন সামান্য কারণে স্বামী তাহার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া শূন্যে ঝুলাইয়া নাগরদোলা চড়ার অভিজ্ঞতা তাহাকে দিয়াছে; পরক্ষণেই কত আদরের কথা বলিয়াছে। প্রহারের পর মিলন ঘটিলে মুসল্লী দোপাট্টা এবং অমৃতসহরের জরীদার নাগরা জুতা কিনিয়া দিয়াছে। আজ সে জ্যেষ্ঠা গৃহিণী ব্যতীত আর কিছু নয়।....পালোয়ান তখন তাহাকে কথায় কথায় সন্দেহ করিত। আজ পর-পুরুষের সহিত একলা বসিয়া কথা বলিলে ফিরিয়া একবার দেখেও না। পরপুরুষের সহিত কথোপকথনে বেলা হইয়া গেলে বলে "এখনো খাওনি, বেলা হয়ে গেছে যে।" এ আদরের পিছনে প্রাণের সাড়া নাই, আছে কেবল কর্ত্তব্যের শ্রুতিমধুর

বাণী। যখন পুরাতন স্মৃতিগুলি মনে নানা আন্দোলন তুলিতেছিল, সেই সময় শোনা গেল বেদেনী ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। সকলেই বুঝিল এ বাড়ীতে চতুর্থীর স্থান পাকা হইয়া গেল। কারণ প্রহার দানের পর সুন্দরীর ক্রন্দন পালোয়ানকে দয়াল করিয়া তোলে। কিছুদিন আদর-যত্নে আপ্যায়িত না করিয়া ছাড়িয়া দেয় না।

....সপ্তাহকাল কাটিয়া গিয়াছে। ইরাণী পরিয়াছে পালোয়ানের দেশী পোষাক। কুঁচী দেওয়া পায়জামা, লম্বা চুড়ীদার পাঞ্জাবী, তাহার উপর ওড়না....দৰ্জ্জী বানাইতেছে নয়া মুসল্লী দোপাট্টা।

পালোয়ান যখন গাড়ী লইয়া ভাড়া খাটিতে যায় তখন বাহির হইতে শিকল তুলিয়া তালা-চাবি লাগাইয়া দেয়। সহরে সরকারী বে-সরকারী নীতি বাদীদের অভাব নাই। কখন্ কোন্ দলের মানুষ, তাহার সংগ্রহের সামান্য পুঁজি আবিষ্কার করিয়া ফেলিবে ঠিক নাই। শেষের দুইটি সংগ্রহ সম্বন্ধেই তাহাকে বেশী সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। বেদেনী অনেকটা বাগ মানিলেও, তৃতীয়ার স্বভাব এখনও সন্দেহজনক। একটু সুবিধা পাইলেই উস্‌খুস করিয়া থাকে। তাহারই সহিত বেদেনীর হইয়াছে মিতালী, যাহা পালোয়ান সমর্থন করে নাই। কি জানি, উভয়ের মিলিত বুদ্ধির ব্যবহারে পিঞ্জরদ্বার উন্মুক্ত হইয়া যাইতে কতক্ষণ। একের বিরুদ্ধে অপরের আক্রোশ থাকিলে খাঁচা কাটিবার সম্ভাবনা কম।....

আজ প্রত্যুষেই পালোয়ান ফুল্‌কা রোটী আর গোস্ত লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। চারিটি প্রাণী বাড়ীর ভিতর বন্দিনী।....বেদেনী জানলার ধারে গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দৃষ্টি তাহার সামনের দেয়াল ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে....বহু দূরে খোলা মাঠে গাছের তলায় ছিন্ন গুণচটের তাঁবুর পাশে। বেদেনী উতলা হইয়া উঠিল মুক্তির জন্য, মাথার উপর দিগন্তব্যাপী আকাশ দেখিবার জন্য। এই কয়দিনেই বাঁধা ছাদের তলায় থাকিয়া সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। পলাইতেও পারিতেছে না....পালোয়ানকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু মরদ তাহাকে নিজের মত চালাইতে চায়,....আচরণটি বেদেনীর নিকট অনাচার। সে জীবনে কখন কাহারও হুকুম মানিয়া চলে নাই। ইতিমধ্যে বহুবার সঙ্কল্প করিয়াছে পলাইবে, কিন্তু ইচ্ছাটা সতেজ হইয়া উঠিতেছে না। পলাইলে, এমন একটি মরদ পাইবে কোথায়? বেদেনীর চিন্তা গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। সে পুরুষের মতই পিছনে হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উন্মত্তার মত ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর পায়চারী করিতে লাগিল। সিদ্ধান্ত ঘনঘটা করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট দিকে চলিতেছিল। মন তাহার কালবৈশাখীর ঝড়ের রূপ লইয়াছে....পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতে চায়। বেদেনী ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে মরদের ধর্ম্ম বদ্‌লাইয়া দিবে। তাহাকে বেদুইনের জাতে তুলিবে—ভবঘুরে

করিয়া ধরিত্রীর বুকে, খোলা মাঠে, সহরের রাস্তায় ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইবে। পালোয়ান যদি বেদের পরিচ্ছদ পরে, কি সুদর্শনই না সে দেখিতে হইবে!....দলের মেয়েরা তাহাকে ঈর্ষান্বিতভাবে দেখিবে। কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য বেদেনী সেই মুহূর্ত্ত হইতে পথ খুঁজিতে লাগিল পালোয়ানকে মুসলমান করিবার জন্য।

একটি মাসও কাটে নাই, পালোয়ানের চারিত্রিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যাহা বধূত্রয়ের উৎকণ্ঠার কারণ হইয়া উঠিতেছিল। এরূপটি তাহারা কখন দেখে নাই। তাহাদের সামনেই কত মেয়ে আসিল কত মেয়ে গেল, পালোয়ান কখন কোতোয়ালী অথবা নারীর নিকট ধরা দেয় নাই। বেদেনী হয়ত জীনকে জানে, তাহা না হইলে পালোয়ান দিনের পর দিন বদলাইয়া যাইতেছে কেন? ....পালোয়ান এখন বাড়ীর ভিতর পোষাক পরে বেদুইনদের মত, ইরাণী ভাষায় কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে। গাড়ী চলা একরকম বন্ধই হইয়া গিয়াছে। দিবারাত্রি ইরাণীকে লইয়া ঘরের ভিতর পড়িয়া থাকে। আয় নাই, তথাপি বেদেনী নিত্য নূতন পোষাক পরিতেছে! এই সেইদিনকার কথা।....কাহার গলা হইতে সোনার হার ছিনাইয়া আনিয়া সকলের সামনে ইরাণীর গলায় পরাইয়া দিল। উপরি আয় কি ভাবে হইতেছিল, সকলেই অনুমান করিয়াছিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে নাই। ট্যাক্সিতে চড়াইয়া ভদ্রমহিলার গহনা কাড়িয়া লওয়া পালোয়ানের নূতন ব্যবসা না হইলেও পূর্ব্বে এত ঘন ঘন হইত না। তিনটি বধূই কাণাঘুষা করে, পালোয়ান প্রেমে পড়িয়াছে, এইবার পুলিশের নিকট ধরা পড়িবে।... এইভাবে সময় কাটিতেছিল।....

....হঠাৎ একদিন প্রভাতে দেখা গেল বেদেনীর ঘর খোলা—বাহিরের দরজা খোলা। পালোয়ান ও বেদেনী গাড়ীসহ অন্তর্দ্ধান হইয়াছে।

পালোয়ানের বাড়ী ছাড়িবার পর তিন চারদিন কাটিয়া গিয়াছে। পুরাতন তিনটি বধূর কি হইয়াছিল সন্ধান লইবার স্পৃহা আসে নাই! এঁদো গলিতে ঢুকিয়াছিলাম ইরাণীর দেহ-সৌষ্ঠবের আকর্ষণে।....আমি ইরাণী ও তাহার মরদের পিছু লইয়া পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে আসিয়া পড়িয়াছি।

ইরাণীরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে পালোয়ানের পাল্লায় পড়িয়া স্নান করিতে শিখিয়াছে।.... প্ল্যাটফর্ম্মের কলতলায় সে স্নান করিতেছিল। ঊর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত....দৃশ্যটির আকর্ষণ অতীব। সেই কারণে সামান্য দূরে ভিড় করিয়া পুরুষের দল সমবেত হইয়াছে। কেহ পার্শ্বের বন্ধুকে কনুইএর গুঁতা মারিয়া রসিকতা করিতেছে, কেহ নির্ব্বাক অবস্থায়, নিষ্পন্দ নেত্রে রমণীর কাম-প্রজ্জ্বলিত মাংসের বেগবান স্পন্দন দেখিতেছে। বেদেনীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।....স্নানান্তে বেদেনী পালোয়ানের নিকট আসিতেই কলতলা ছাড়িয়া সকলে উভয়কে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

পালোয়ান অভিমানের স্বরে বলিল, "এ কেমনতর তোমার আচরণ, অতগুলো পুরুষের সামনে"....

বেদেনী মরদের খাড়া নাকটা জোরে টান মারিয়া গণ্ড টিপিয়া উত্তর দিল—"আরে ছিঃ....ওরা কি পুরুষ ? মরদ বলতে তোমাকেই জানি।"....পালোয়ান সন্তুষ্ট হইয়া উচ্ছ্বসিতভাবে দিল পেয়ারের বেদেনীকে এক ঝাঁকুনী। দেহের উচ্চাংশগুলি দুলিয়া উঠিল। মৃদু সমীরণে যেন দুইটি প্রস্ফুটিত গোলাপ উভয়কে স্পর্শ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে।....পালোয়ান বেদেনীর সান্নিধ্যে ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত হইয়া উঠে—যে উচ্ছ্বাসকে দমন করা তাহার নিকট দুঃসাধ্য কার্য্য। এই উচ্ছ্বাসের নিবৃত্তির জন্যই তো সে নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছে। ধর্ম্ম ছিল তাহার নানকপন্থীর, এখন হইয়াছে সে মুসলমান। নিজের পোষাক পরিত্যাগ করিয়া সে সাজিয়াছে বেদুইন। পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তনে বেদেনীর পাশে তাহাকে লাগিতেছিল ভাল। যেন চড়া ও খাদের সুরে মিল ঘটিয়াছে। পালোয়ানের কঠিন হস্তের স্পর্শে বেদেনীও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এতগুলি মানুষ সাক্ষী রাখিয়া মনোভাবের পূর্ণ প্রকাশে অসুবিধা বোধ করিতেছিল।....বুভুক্ষুর সামনে অন্ন রহিয়াছে, অথচ তাহা ব্যবহারের উপায় নাই। বিঘ্ন তাড়াইবার জন্য নাগিনী ধরিল ফণা—পোঁট্লা হইতে বাহির করিল শাণিত ছোরা। তাহার পর রাখিল বাম কটির উপর হাত....যন্ত্রের ন্যায় গ্রীবা ধারণ করিল বঙ্কিম রূপ....তৎপরে সুরু হইল কোমর হইতে উর্দ্ধ অঙ্গের দোলা। পালোয়ান ইহা লক্ষ্য করিয়া মিঠি জবানে ছোরাটি চাহিয়া লইল এবং পোঁট্লার পাশে রাখিয়া দিল। এইবার পালোয়ানের পালা....অকস্মাৎ সে আখড়ার প্রথায় হুঙ্কার দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। ভীতিপ্রদ দৃশ্য !.... যেন স্বয়ং ভীম যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে।....দুর্ব্বল পুরুষগুলি বিনা বাক্যব্যয়ে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিল।

....পার্ব্বতীপুর হইতে রংপুর মাত্র কয়েকটি ষ্টেশন পরে। রংপুরেই তাজহাটের প্রাচীন রাজবাড়ী। দুর্গাপূজার মেলা সেখানে শেষ হইয়া গিয়াছে। এই মেলায় প্রতিদিন লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হইয়া থাকে এবং পূজার চারদিন ধরিয়াই চলে। মনুষ্য সমাগমের আকর্ষণও থাকে যথেষ্ট। বেদুইনের দল তাহার মধ্যে একটি। ম্যালেরিয়ায় প্রপীড়িত প্লীহাযুক্ত কৃশকায় ও কৃষ্ণবর্ণ মানুষগুলি দুধে আলতা গোলা রং, সবল ও সুগঠিত জীবদের উৎসবের একটি অঙ্গ বলিয়াই ভাবে। দুষ্ট হাওয়ার দোলার অপেক্ষায় থাকিয়া অনেকে শেষ পর্য্যন্ত ত্রিগুণ দাম দিয়া একটি বাজে কাঁচি পর্য্যন্ত কিনিয়া ফেলে।

....উৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে। বেদুইনের একদল ফিরিয়াছে পার্ব্বতীপুরের ষ্টেশনে। পার্ব্বতীপুর নেহাৎ ছোট জাংশন নয়। সাহেবরা এখানে অধিক মূল্যে বেদুইনদের নিকট হইতে

অনেক কিছুই কিনিয়া থাকে। কারণ দেশী মানুষ অপেক্ষা উহাদের সৌন্দর্য্যবোধ বেশী। রসতৃপ্তির জন্য উহারা খরচ করিতে কৃপণতা করে না। সেই কারণে বেদুইনের দল এইখানে দুই চারি দিন থাকিয়া যায়।

....পরের দিনের ঘটনা। বেদেনী অন্ধকার থাকিতেই পালোয়ানের অনুরোধে কলতলায় স্নান করিতে আসিয়াছে। পালোয়ান তখন ঘুমাইতেছিল। বেদেনী উঠিয়া যাওয়ায় পাশের পোঁটলাকে বেদেনী ভাবিয়া বক্ষের অতি নিকটে টানিয়া লইয়াছিল।

কলতলায় একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। বেদেনীর পুরাতন প্রেমিক পানীয় জলের জন্য একই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বেদেনীকে দেখিয়া তাহার বিস্মৃত নাম ধরিয়া ডাকিল। বেদেনীর কর্ণে যে শব্দ ধ্বনিত হইল তাহার প্রেরণায় সে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল। যাহাকে নিজের করিবার জন্য প্রেমিকের বধূকেও খুন করিতে চাহিয়াছিল। অপ্রত্যাশিত চির-পরিচিতের আহ্বান শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আহ্বানকারীর দিকে তাকাইল। যাহাকে দেখিল সে সেই চিরবাঞ্ছিত। ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর সব কিছু ভুলিয়া মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল এবং পর মুহূর্ত্তে দেহ ও মন উৎসর্গ করিয়া দিল। অল্প সময়ের ভিতর প্রেমিক জানাইয়া দিল এখন উভয়ের মিলনে কোন অন্তরায় নাই। তাহার পুরাতন বধূ মরিয়াছে। কণ্টকহীন জানিয়া বেদেনী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। উহা কামোন্মত্তার উচ্ছ্বাস নহে, গভীরতম প্রেমের নিবেদন। নারী হঠাৎ কি ভাবিয়া প্রেমিকের দৃঢ় আলিঙ্গন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া ফেলিল। তাহার পর সোজা চলিয়া গেল পালোয়ানের নিকট। সে জানিত পালোয়ান তাহার প্রেমনিবেদনের দৃশ্যটি দেখিলে নিরবচ্ছিন্ন দৈহিক শক্তির দ্বারা তাহার দলের প্রত্যেকটি পুরুষকে পশুর মতই খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে।

....পালোয়ানের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে তাহার মন নানারূপ দ্বিধায় ভরিয়া উঠিল। অপূর্ব্ব-গঠন পালোয়ানের তুলনায় প্রেমিক চিড়েই হইয়া যায়, তথাপি বাঞ্ছিতের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। পরক্ষণেই পালোয়ানের দৃঢ় মাংসপেশীবহুল বিশাল বাহুদ্বয়ের আবেষ্টনের কথা মনে আসিল—পালোয়ান তখন স্বপ্নরাজ্যে বিভোর হইয়া আছে। মুখশ্রীতে শিশুসুলভ আনন্দোচ্ছ্বাস সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। থাকিয়া থাকিয়া পার্শ্বের পুলিন্দাটা দৃঢ়ভাবে নিকটে টানিয়া লইতেছে। হয়ত বা স্বপ্নজগতে পুলিন্দাটাকেই বেদেনী ভাবিয়া নিকট হইতে অতি নিকটে পাইবার জন্য প্রাণ ভরিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিতেছিল।

....প্ল্যাটফর্ম্মে গ্যাসের আলো তখন জ্বলিতেছে। বেদেনী পালোয়ানের গঠনসৌন্দর্য্য ও প্রেমিকের প্রাণ-উজাড়-করা কয়টি কথা তুলনা করিতেছিল—"মিলনে এখন কোন অন্তরায়

নাই।"....বেদেনী অকস্মাৎ বীভৎস সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল।....ধীরে এবং সন্তর্পণে তাহারই নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া ছোরাটা পুলিন্দার পাশ হইতে উঠাইয়া লইল....মুষ্টির চাপ বাঁটের উপর দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল।....পরক্ষণেই পালোয়ানের বক্ষে ছোরা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল।....

....মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষীণ কাতর ধ্বনি উত্থিত হইলেও সে পুলিন্দাটিকে বক্ষের অতি নিকটেই রাখিয়াছিল। হয়তো বা সেই সময় সে গভীরভাবে নিদ্রার জগতে বেদেনীর প্রতি প্রেম নিবেদন করিতেছিল। ধারালো ছোরা তাহার বিরাট কপাটবক্ষে বিদ্ধ অবস্থাতেই রহিয়া গেল।....পুলিন্দা বেদেনীর স্থান দখল করিয়া বীরের তাজা রক্তে রঙীন হইয়া উঠিল।....

...পালোয়ান জানিল না, বেদেনী তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে

ডিগুভামেটার জঙ্গল, করনুল

(সত্য ঘটনা)

শিকারের নেশায় ঘুরিতে ঘুরিতে মান্দ্রাজ হইতে পাঁচ শত মাইল দূরে করনুল দেশে ডিগুভামেটা গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছি। এই দুর্দ্দিনে শিকার-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে কুণ্ঠা আসার কথা, কারণ উহা লোকমতে বিলাসিতার একটি অঙ্গ। শিকার আমার নিকট ঠিক বিলাস নহে, বাঁচিয়া থাকার একটি অবলম্বন ; প্রকৃতিগত ধর্ম্ম—যাহা অহরহ সভ্যতার নানা উৎকর্ষের সংস্পর্শে আসিয়াও কিছুমাত্র সংস্কৃত হয় নাই, আদিম বুনো অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে।

সংস্কারবদ্ধ ধর্ম্মান্ধ পুণ্যার্থে যেভাবে নানা ক্লেশ স্বীকার করিয়া তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ অনেক সময় অনাহার ও অনিদ্রা সহ্য করিয়া শার্দ্দূল দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ম্যালেরিয়াক্রান্ত দেশে গভীর অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াই। ভয়ঙ্করের রূপ দর্শনে মুগ্ধ হই, বধ করিতে পারিলে অবর্ণনীয় আনন্দ পাইয়া থাকি। অহিংসাবাদী এই আনন্দকে বলিবেন পৈশাচিক হিংস্র প্রবৃত্তি। বলুন, তাঁহার আত্মতৃপ্তিতে বাধা দিব না। আমার বক্তব্য বিষয় শিকার, ধর্ম্মনীতি অথবা দর্শনতত্ত্বের গবেষণা নহে। সুতরাং ঘটনাগুলি লিখিয়া যাই।

স্থানটি মান্দ্রাজ প্রদেশের একটি বিখ্যাত মৃগয়াভূমি। এইখানে অপ্রত্যাশিতভাবে একটি নূতন রকমের মানুষ আবিষ্কার করিলাম। ভদ্রলোক স্থানীয়, রেঞ্জ অফিসার, নাম শ্রীযুক্ত পি,

চিঙ্গেল রেডি। তিনি অযাচিতভাবে পরোপকার করিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে বলিয়া বসেন, ক্রটি থাকিলে মার্জ্জনা করিবেন। প্রগতির যুগে প্রকাশ্যে এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়া তিনি একঘরে না হইয়া কেমন করিয়া সুস্থভাবে টিকিয়া আছেন জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া বুঝিলাম তাঁহাকে চালাকের সমাজ হইতে দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয়, কারণ তিনি বেপরোয়া ধরণের মানুষ, তাহার উপর মিথ্যা কথা পারতপক্ষে বলিতে চান না। রেডি মহাশয়ের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করিলাম, কারণ এই কাহিনীর সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ আছে।

ষ্টেশনে আসিতেই দেখিলাম তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সদলবলে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। পোষাকে সনাক্তের চিহ্ন ছিল, চিনিতে অসুবিধা হইল না। ট্রেন হইতে নামিয়া আমার সহযাত্রী শ্রীযুক্ত আনসারি পাতসার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলাম। পাতসা সাহেবকে সঙ্গে আনিয়াছিলাম, জঙ্গলের নানা অসুবিধা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায়, কারণ তিনিও জঙ্গল দেশের লোক, ভিন্ন স্থানের রেঞ্জ অফিসার।

ষ্টেশনের বাহিরেই গোযান অপেক্ষা করিতেছিল—রাইফেলের গাদা ও অন্যান্য ভারী মাল তাহাতে তুলিয়া দিয়া আমরা হাঁটিয়া ফরেষ্ট বাংলোর দিকে চলিতে লাগিলাম। বেলা তখন পাচটা হইবে।

প্রথমেই কাজের কথা পাড়িলাম—ইতিমধ্যে বাঘ কোন গরু অথবা মহিষ মারিয়াছে কিনা। উত্তর আসিল, "না"। কুড়ি দিনের ছুটি মজুত ছিল—দমিলাম না। পরে কথাপ্রসঙ্গে জানিলাম—আমার শিকারের জন্য ক্রীত তিনটি মহিষ বিভিন্ন মওড়ায় গত চার দিন ধরিয়া বাঁধা হইতেছে, কিন্তু জন্তুগুলি জাবর কাটা ছাড়া অন্য কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই। ইহার পর পথে শিকার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আর কোন কথা হয় নাই। ফরেষ্ট বাংলো ষ্টেশন হইতে অতি নিকটে, পৌছাইতে সময় লাগিল না, চতুষ্পার্শ্বে জঙ্গল, আবেষ্টনী ভাল লাগিল।

অপরাহ্ণ উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, একটু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলাম—প্রশ্ন করিলাম আজ মাচানে বসা চলে না? রেডি মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন, "সমস্ত রাত, সমস্ত দিন ট্রেনে গেল, আজই মাচানে বসবেন? আজ ক্লান্ত হয়ে আছেন বরং বিশ্রাম করুন।" মনে মনে ভাবিলাল, হায় রে, আমি কেন দুর্ম্মুখ G. B. S-এর মত বলিতে পারি না—গড়াইল গাড়ীর চাকা, আর ক্লান্ত হইলাম আমি! অনুমান করিলাম, মাচান তৈয়ারী হয় নাই। সন্দেহ ভঞ্জন নিমিত্ত সলজ্জ ভাবে উত্তর দিলাম, ট্রেনে বসিয়া বসিয়া ভ্রমণ করিলে আমার ক্লান্তি আসে না। ভদ্র সন্তানের পক্ষে, এমন একটি উক্তি শোভনীয় হইবে না জানিয়াই কৃত্রিম লজ্জার অবগুণ্ঠন টানিয়াছিলাম।

আমার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। রেডি মহাশয় বলিলেন, মাচান তো তৈরী নেই, বেলা

পড়ে গেছে, সন্ধ্যার আগে যদি কোন প্রকারে দাঁড় করান যায় তো আপনাকে live baitএর উপর বসতে হবে। এদিকটা আবার সবই 'ষ্ট্রাইপ্স্' (বড় বাঘ) গুলি না লাগলে ক্ষতি নেই কিন্তু ঠিক জায়গায় তাগ না হলেই বিপদ। বাঘ জন্তুটা বড় বটে, কিন্তু vital part তো বড় নয়। নিশানাটা খুব পাকা হওয়া দরকার, কারণ বাঘ যখন পশু আক্রমণ করে তখন অত্যন্ত সতর্ক থাকে। তাড়াহুড়ায় ভুল জায়গায় গুলি লাগলে সে পশুকে ছেড়ে শিকারীকেই তাড়া ক'রে বসে। এদিক-কার এলাকায় সব দিকেই মহিষ বাঁধা হয়ে গিয়েছে, এখন সান্দ্রাপাড়ুর পথে চেষ্টা করা চলে, কিন্তু সেখানে গাছগুলো বেজায় নীচু, তার উপর পলকা। জীবন্ত মহিষ রেখে বসা ঠিক হবে না। কয়েক দিন অপেক্ষা করুন একটা-না-একটা মহিষকে ঠিক মেরে দেবে, তখন ধীরে সুস্থে মাচান বেঁধে মারবেন। বসে বসে খাবে, টিপ করবার অনেক সময় পাবেন।

পূর্ব্ব হইতে মাচান না বাঁধার ত্রুটি সামলাইতে গিয়া রেডি-মহাশয় অযথা পাকেপ্রকারে আমার লক্ষ্যভেদনৈপুণ্যের উপর কটাক্ষপাত করিতে ছাড়িলেন না। ইচ্ছা হইল রাইফেল বাহির করিয়া তখনই লক্ষ্যভেদের ভেল্কিবাজী দেখাইয়া দি, কিন্তু বিরত হইলাম এই ভাবিয়া, হয়ত ভদ্রলোক অনেক নামকরা শিকারীর টিপ স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়া থাকিবেন। সেই কারণেই নিশানা সম্বন্ধে তিনি সহজে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারেন না, তা ছাড়া, আমি ডিগুভামেটায় আসার দরুন তাঁহার অভিভাবকত্বের দাবিও জন্মাইয়াছিল, যাহা আমার মত পরমুখাপেক্ষী অস্বীকার করিতে পারে না।

গল্প করিতে করিতে তিনি জানাইয়া দিলেন—কতকগুলি সাহেব ও দেশী অফিসার এখানে শিকার করিতে আসিয়া বাঘের কামড়ে মরিয়াছিল। ঘরের ছেলে ঘরে মরিলে তাঁহাকে শবদেহগুলি লইয়া আলাতনে পড়িতে হইত না। অনভিজ্ঞ শিকারীর দল মরিয়া মরিয়া তাঁহাকে কি ভাবে নাজেহাল করিয়াছিল তাহার বিশদ বিবরণ দিয়া চলিলেন। গল্প চলিতেছিল তাহারই ফাঁকে নিকটেই সম্বরের (অশ্বের ন্যায় বৃহৎ মৃগ) ডাক শুনিলাম। চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম, বাঘ শিকারে না আসিলে হাতে রাইফেল লইয়া শব্দ অনুসরণ করিতাম। কিছুক্ষণ পরে পাচক আসিয়া জানাইয়া গেল খানা প্রস্তুত। গভীর অরণ্যে কুক্কুট মাংসের সহিত মোগলাই পরোটার যোগাযোগ কল্পনাও করিতে পারি নাই। পরম পরিতোষের সহিত আহার শেষ করিয়া কায়মনোবাক্যে রেডি-মহাশয়ের কল্যাণ কামনা করিলাম।

পরের দিন সকালে সান্দ্রাপাড়ুতে যাইবার প্রস্তাব করিলাম। রেডি মহাশয় বিপদের কথা পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন, পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, আমি মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করিতে চলিয়াছি—কিন্তু আমার সঙ্কল্প স্থির দেখিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও সান্দ্রাপাড়ুতে মাচান বাঁধিবার আদেশ দিলেন।

মাচানের কামুফ্লাজিং (camouflaging) সম্বন্ধে আমি একটু বাতিকগ্রস্ত। সব দিক হইতে নিজে না দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি না। শিক্ষিত বাঘেদের আবার উঁচু নজরটাই বেশী, বেটের (bait) নিকটে আসিবার আগে গাছের ডালগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইয়া থাকে। আবেষ্টনীর সহিত সামান্য গরমিল দেখিলেই সন্দিগ্ধ হইয়া পড়ে এবং বধ্য জীবটি যতই সুস্বাদু হউক না কেন, অবহেলায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

বেলা চারটার সময় রওনা হইলাম। পৌঁছাইতে ঘণ্টাখানেক লাগিয়াছিল। এদিকটা ডিগুভামেটার মত নয়। অনুর্ব্বর জমি, রৌদ্রতাপে স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে। মাচানের নিকটে আসিয়া দমিয়া গেলাম—বেজায় নীচু, সাত-আট ফুটের বেশী হইবে না, তাহার উপর ছোট ঘরের মত দেখাইতেছে—যথাসম্ভব ত্রুটিগুলি সংশোধন করিয়া বেলা থাকিতেই বর্ণবাস (স্থানীয় বৃদ্ধ শিকারী) সহ উপরে উঠিলাম। রাইফেল ও গান্ পাশাপাশি রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম। মহিষটি মাচান হইতে প্রায় এক শত ফুট দূরে বাঁধা হইয়াছিল—ব্যবধানটি ভালই লাগিল। জখম হইলেও এক লাফে বাঘ ঘাড়ের উপর আসিতে পারিবে না—দুই বার গুলি চালাইবার যথেষ্ট সময় পাইব। কুলীদের মাচানের কাছাকাছি বসিয়া গল্প করিতে বলিয়া দিলাম। লোকগুলি মাচানের নিকট গল্প করিলে বাঘ সন্ধ্যার সময়েও এদিকে আসিবে না, ইত্যবসরে বাঘকে ভড়কাইয়া আমি মহিষের কাঁধে টর্চ্চ ফেলিয়া আলো ঠিক করিয়া রাখিতে পারিব।

যে-স্থানটিতে মহিষ বাঁধা হইয়াছিল সেখানে ঘন ঝোপের জন্য সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কাজ চালনর মত অন্ধকার হইয়া আসিল -সুবিধাটি কাজে লাগাইলাম। আলোর ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেলে লোকগুলিকে গল্প করিতে করিতে চলিয়া যাইতে বলিলাম। তখন আকাশের পিঙ্গল-মিশ্রিত ফিকে গোলাপী রং মলিন হইয়া আসিতেছিল। দূরের পাহাড়গুলি একের পর এক অন্ধকারে মিলাইতে সুরু করিয়াছে—মাঝে মাঝে কেকারব শুনিতেছি—এক জোড়া বুলবুল পাশের ঝোপে মিহি সুরে গান ধরিয়াছে। মৃদু সমীরণে, দূর হইতে বনফুলদলের মধুর গন্ধ বহিয়া আসিতেছে। আবেষ্টনীতে রোমান্সের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, প্রকৃতির এই রসলীলায় আমিও মাতিয়াছি, বয়স কমিয়া যাইতেছে, কল্পনা রসরাজ্যে অভিযানের জন্য প্রস্তুত। ঠিক এমনি সময় শুনিলাম, খস্ খস্ খস্ শব্দ—মাচানের পিছনে। শুষ্ক পত্রের উপর সন্ত্রস্ত পদবিক্ষেপে কোন জন্তু চলিয়া আসিতেছে—গতি তাহার মন্থর। সঙ্গে সঙ্গে বর্ণবাস আমাকে স্পর্শ করিল—সঙ্কেতে জানাইয়া দিল প্রস্তুত হও। তাহার সঙ্কেতের অপেক্ষায় আমি ছিলাম না—যথাসময়ে রাইফেল বগলে তুলিয়া লইয়া ছিলাম।

শব্দ থামিয়া গিয়াছে, পলে পলে সময় কাটিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সম্মুখের দৃশ্য অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে—কান খাড়া করিয়া বসিয়া আছি।

কিছুক্ষণ পরে আবার শব্দ আসিল খস্ খস্ খস্ আরও নিকটে এবং কিঞ্চিৎ দ্রুত। উত্তেজনায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে, পাশেই জলাধার রহিয়াছে কিন্তু তাহা তুলিয়া পান করিবার সাহস নাই, পাছে কোন শব্দ করিয়া ফেলি। কতক্ষণ এই ভাবে বসিয়াছিলাম স্মরণ নাই, হঠাৎ গলা এমন ভাবেই খুস্ খুস্ করিয়া উঠিল যে, নিজেকে সামলাইতে পারিলাম না, বহুবার কাশিয়া ফেলিলাম এবং কপালে করাঘাতও করিলাম। সব কিছুই পণ্ডশ্রম হইয়া গেল—নিজেকেই ধিক্কার দিলাম। বর্ণবাস ত্বক্ ও জিহ্বার সাহায্যে যে শব্দ বাহির করিল তাহার আনুমানিক অর্থ—এমন সময় না কাশলেই কি চলত না বাবু—বাঘ যে পালাল! সঙ্কেতটি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত লাগিল।

এখন কিছুরই আশা নাই, মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সশব্দে জলাধার তুলিয়া শুষ্ক কণ্ঠকে সিক্ত করিয়া দিলাম। শ্মশান-বৈরাগ্য আসিয়া গিয়াছে, শ্মশানে সকলেই সমান। সাধারণ টর্চ্চটা মাচানের ভিতরে জ্বালাইয়া বর্ণবাসের হাতে একটা সিগারেট গুঁজিয়া দিলাম, বিশুদ্ধ বাংলাতেই বলিলাম, ফোঁকো,—টান, জোরে আওয়াজ করিয়া ব্যোম্ বলিয়া টান। ভাবিলাম জীবনে আর কখন শিকারে আসিব না। কাল সকালেই বার্থ রিজার্ভ করিতেছি—আজ রাত্রিটা কাটিলে হয়। আমার আচরণে বর্ণবাস কি ভাবিতেছিল কে জানে। উৎকট উত্তেজনার শেষ পরিণাম অবসাদ। আমি উহার কবল হইতে নিস্কৃতি পাই নাই, মাচানের স্বল্পপরিধির ভিতর যেটুকু স্থান করিতে পারিলাম তাহাতেই হাড়-গোড় দুমড়াইয়া শুইয়া পড়িলাম এবং টর্চ্চ নিবাইবার পর অল্প সময়ের ভিতর ঘুমাইয়া গিয়াছিলাম। মাঝে বর্ণবাস আমাকে জাগাইয়া দিয়াছিল।

বর্ণবাসের সঙ্কেতে ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ায় রাইফেলের দিকে হাত বাড়াইতেছিলাম। বর্ণবাস কানের নিকট মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিল, “বাঘ আসে নাই, হুজুরের নাক ডাকিতেছিল।” শুইয়া পড়িলাম, পুনরায় বর্ণবাস সঙ্কেত দিল—এবার তাহার আঙ্গুলের দৃঢ় চাপের সহিত মহিষটার আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম। জীবন্ত মহিষের উপর বাঘ নিশ্চয় লাফাইয়া পড়িয়াছে—এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে মহিষটাকে মারিয়া ফেলিবে।

যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতা সহ সন্তর্পণে উঠিয়া বসিলাম—চকিতে প্রস্তুত টর্চ্চের সুইচ টিপিয়া দিলাম—দেখিলাম মহিষটার পিঠে বাঘ চড়াও হইয়া ঘাড় কামড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। মহিষটা প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিয়া বাঁধন ছিঁড়িবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। বাঘের মাথাটা টর্চ্চের আলোর বাহিরে অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে, মাত্র পিছনটা এবং বুকের খানিকটা অংশ দেখিতে পাইতেছি। তখন কোন্‌টা গান্ এবং কোন্‌টা রাইফেল বাছিয়া লইবার সময় ছিল না। যেটাকে সামনে পাইলাম সেইটাকেই তুলিয়া বুক লক্ষ্য করিয়া ট্রিগার টিপিয়া দিলাম

—সঙ্গে সঙ্গে বাঘ মহিষের অপর দিকে জড়পদার্থের ন্যায় পড়িয়া গেল। বাঘটা মরিয়াছে, এখন ওটা স্তূপীকৃত অসাড় মাংসপেশী ছাড়া আর কিছু নয়, তথাপি মাথায় আর একটা গুলি মারিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতাম। কিন্তু মহিষের পিছনটা আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। মাজাতে মারিতে মন চাহিতেছিল না। দু-নলা ব্রিচ-লোডার দিয়া মারিয়াছিলাম—ভোঁতা লিথেলের আর একটা গুলি লাগিলে চামড়ার কিছু থাকিবে না। বিরত হইলাম।

অনেকক্ষণ আলো জ্বালাইয়া বসিয়া রহিলাম—বাঘ নড়িল না, উহার মৃত্যু সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইয়া টর্চ্চ নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম—তখন ভোর হইতে কত দেরি আছে অনুমান করিতে পারি নাই। উত্তেজনায় নিদ্রা আসিতেছিল না। খানিকটা সময় কাটিতে দেখিলাম বন্দুক রাখিবার বড় ছিদ্র হইতে আলো আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, ভোর হইতেছিল—উঠিয়া বসিলাম। নিজের অজ্ঞাতেই আমার দৃষ্টি বধ্যভূমির দিকে চলিয়া গেল। বাঘ সেখানে নাই। ভাবিলাম দৃষ্টিভ্রম, আলো-আঁধারিতে ভাল দেখিতে পাইতেছি না। টর্চ্চ জ্বালাইলাম, বাঘ সত্যই অন্তর্ধান করিয়াছে। মুহূর্ত্তে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলাম—টর্চ্চ-সংলগ্ন রাইফেল হাতে মাচান হইতে নামিতেছি দেখিয়া বর্ণবাস করজোড়ে নিষেধ করিল। তখন আমার হিংস্র প্রবৃত্তি উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, অন্তরের পশু কোন বাধা মানিল না। অগত্যা বৃদ্ধ তাহার এক-নলা ঠাসা বন্দুকটা লইয়া আমাকে অনুসরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। দো-নলা ব্রিচ-লোডারটা লইতে বলিলাম, সে তাচ্ছিল্যের সহিত প্রত্যাখ্যান করিল। অনুমান করিলাম, সেফ্‌টি লক্‌ ইত্যাদি কলকব্জাওয়ালা বন্দুক সে কখন ব্যবহার করে নাই।

মাটিতে নামিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, বাঘের গোঙানী শুনিবার জন্য। আমি নিশ্চয় জানিতাম সে বেশী দূর যাইতে পারে নাই। কোন শব্দ না শোনায় বর্ণবাসকে ঢিল ছুঁড়িতে বলিলাম। প্রথম ইতস্ততঃ করিয়াছিল, পরে কি ভাবিয়া পাথরের নুড়ি আমাদের সামনে ছুঁড়িতে লাগিল। এদিক ওদিক সেদিকে ঢিল পড়িতেছে, কিন্তু কোন সাড়া নাই। বর্ণবাসকে অগ্রসর হইতে বলিলাম, সে কিছুতেই রাজী হইল না। লোকটা বোকা, আগে চলিলে ঢিল ছোঁড়ার কত সুবিধা পাইত। তাহার সঙ্কল্প দৃঢ় বুঝিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া গেলাম। সামনে ঢিল পড়িতেছে, আমি এক-পা দুই-পা করিয়া অগ্রসর হইতেছি। ঘন ঝোপটার কাছে আসিতেই এমন একটি স্থানে পা পড়িল যাহার স্পর্শানুভূতি নরম, রৌদ্রে দগ্ধ কঠিন মাটির নহে। চমকিয়া তিন-চার পা পিছাইয়া আসিলাম, অভ্যাস বশতঃ রাইফেল বগলে তুলিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহার পর নীচের দিকে তাকাইলাম, পাইয়াছি—ঐ ত আমার হাতে মারা বাঘ। লেজের খানিকটা অংশ দেখা যায়—আবার গলার দিকটাও ঝোপের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ণবাসও দেখিয়াছিল। বলিলাম,

ওটাকে টানিয়া বাহির কর। আদেশ পালন হইতে দেরি হইতেছিল—ফিরিয়া দেখি অতি পাকা শিকারী বন্দুক-হস্তে কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছে।

অগত্যা মাটিতে রাইফেল রাখিয়া বলিলাম—আমি টানিয়া বাহির করিতেছি, তোমার এক-নলাটা ঠিক করিয়া ধর। বাঘকে নড়িতে দেখিলে গুলি চালাইয়া দিও। বলিয়া রাখা ভাল, আমার শারীরিক শক্তি সাধারণ বাঙালী যুবকের তুলনায় কিছু বেশী। কুস্তীর আখড়ায় ইহার প্রমাণ বহুবার পাইয়াছি, কিন্তু একলা বাঘটাকে টানিয়া বাহির করা সহজ বোধ হইল না। এই প্রসঙ্গে একটি স্বীকারোক্তির প্রয়োজন বোধ করিতেছি—হত জন্তুটি একটি অতিকায় লেপার্ড—চিতা নয়, "ষ্ট্রাইপস্"ও নয়—লম্বায় ৮ ফুট ৪ ইঞ্চি, এত বড় লেপার্ড সচরাচর বড়-একটা দেখা যায় না। ঘুমন্ত চোখে টর্চ্চের অত্যুজ্জ্বল আলোয় ঠিক বুঝিতে পারি নাই, উহার বিরাট বপুই দৃষ্টিভ্রম ঘটাইয়াছিল।

আমার টানাটানিতে মৃত লেপার্ড কোন আপত্তি না করায় বর্ণবাস সাহায্য করিতে আসিল।

গত রাত্রিতে বন্দুকের আওয়াজে এ অঞ্চলে সকলেই জানিয়াছিল গুলি চলিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বাংলো হইতে মালবাহক ও গ্রাম হইতে কৌতূহলী দর্শকের দল আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের মুখ দেখিয়া মনে হইল সকলেই খুশী হইয়াছে। আমি তাহাদের আনন্দে প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতে পারিতেছিলাম না। ইহার জন্য তো ঘর ছাড়িয়া পাঁচ শত মাইল দূরে আসি নাই। তবু মন্দের ভাল। মনে বল পাইলাম—এখনও সাত-আট দিন ছুটি আছে। ঠিক করিয়া ফেলিলাম, নজরানা যাহাই লাগুক বড়কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ফিরিতেছি না।

বাংলোয় ফিরিতে দেখিলাম রেডি মহাশয় অত সকালেই আসিয়াছেন। পাতশা সাহেব তাড়াতাড়ি লেপার্ড পরীক্ষা করিতে ছুটিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার শুভেচ্ছার জন্যই আপনার সাফল্যলাভ হইল।" মনে মনে ভাবিলাম বলি—"ঘুমন্ত চোখে দেড় সেকেণ্ডের ভিতর প্রায় এক শত ফুট দূরে চার ইঞ্চি টারগেট (লক্ষ্যভেদ) যতই সোজা মনে হউক না কেন, উহা বহু বৎসরের নিয়মিত সাধনার ফলে সম্ভব হইয়াছে। বিশেষ করিয়া রাত্রিতে টর্চ্চের আলোয় নিশানা ঠিক করা বরাতের উপর নির্ভর করে না।" কিন্তু বলা হইল না, ভদ্রাচারের শাসনে স্বীকার করিলাম—তিনি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন না করিলে বাঘের গায়ে গুলি লাগিত না।

রেডি মহাশয় মহিষটাকে সুস্থ অবস্থায় চলিয়া আসিতে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "আপনার টিপ অসাধারণ।" এই ধরণের আত্মপ্রশংসা শুনিবার জন্যই তাঁহার দিকে প্রার্থী হইয়া তাকাইয়াছিলাম। তৃতীয় পুরুষকে প্রাপ্য সম্মান দিতে অনেকেই কার্পণ্য করিয়া থাকেন। রেডি মহাশয় বাস্তবিক গুণগ্রাহী, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি বলিয়া চলিলেন—কপালের কথা যদি বললেন তো সে আমাদের বর্ণবাসের, হরিণ মারতে গিয়েছিল—মেরে দিল বড়

বাঘ ঐ এক-নলা ঠাসা বন্দুক দিয়ে, যার front sight, rear sight কিছুই নেই ! শুধু একটি নল। ঝোপের ভিতর লুকিয়ে বসেছিল, চুনমাখান বন্দুকের নলটা বার ক'রে। বাঘ মশাই তাঁর মাথাটা বন্দুকের নলে ঠেকিয়েই চুলকানর ব্যবস্থা করলেন। আর বর্ণবাস ঘোঁড়া টিপেই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। বাঘ মরল, বর্ণবাসকেও হয়ত বাঘিনী এসে শেষ করত যদি না লামবাডিরা (স্থানীয় জঙ্গলী, জীবিকা গোচারণ) ফিরতি-মুখে ওকে দেখতে পেত।

পরশ্রীকাতরতাবশতঃ আমি কথাটা চাপা দিলাম। ঐ ধরণের ভাগ্যবান্ পুরুষ আমার নিকট চক্ষুশূল। প্রশ্ন করিলাম—আজ কোথায় বসা যাবে ?

রেডি মহাশয় উত্তর করিলেন, এখানে বড় বাঘ নেই, ঐ লেপার্ডটাই বড় বাঘের ঘরোয়ানা চালে দীক্ষিত হয়ে গ্রামবাসীদের অস্থির ক'রে তুলেছিল। আপনি এবার চিন্তামণিপাড্ডুতে চেষ্টা ক'রে দেখুন—সে ভারী জঙ্গল, তবে ১৩-১৪ মাইল দূরে।

আমি জানাইয়া দিলাম, পাঁচ শত মাইল যখন আসিয়াছি তখন তাহার সহিত ১৩-১৪ মাইল যোগ দিতে কোন অসুবিধা হইবে না। রেডি মহাশয় কাজের লোক, কালবিলম্ব না করিয়া তখনই কতকগুলি কুলীকে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে পাতশা সাহেবের ছুটি ফুরাইয়াছিল—তিনিও সেই দিন মাদ্রাজের দিকে রওনা হইলেন। লেপার্ডের চামড়া ও মাথার খুলি তাঁহার সহিত দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম—ট্যান করাইবার জন্য।

পরের দিন আমরা বেলা তিনটার সময় রওনা হইলাম। আস্তানায় পৌছাইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সমস্ত অপরাহ্ণ-রৌদ্রে ঝলসাইয়া গিয়াছিলাম—বাহিরের চাতালে বসিয়াছিলাম—ঘরের ভিতর পিঙ্গল মাল গুছাইয়া রাখিতেছিল।

আসিবার পথে পাথরের বিরাট রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাহারই কথা মনে আসিতেছিল—অতীতের কত কথাই না উহার অন্তরে লুকাইয়া রহিয়াছে। কালের ধ্বংসলীলায় বহিরাকৃতি স্তরে স্তরে ফাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্তরের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নাই। কবির বাণী মনে পড়িল—'কথা কও, কথা কও, হে অতীত'। বটের শিকড়ের নিবিড় আবেষ্টন দেখিলাম—কি ভয়ঙ্কর মিলন-দৃশ্য। শিকড়ের দৃঢ় চাপে পাথর নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে তথাপি উহা বন্ধনমুক্ত হইতে চায় না। ইহা প্রেম, না শক্তির পরীক্ষা ?—ভাবিলাম শক্তিশালীর ঘনিষ্ঠ মিলন বোধ হয় এই ভাবেই হওয়া স্বাভাবিক। পাদমূলে বনস্পতি ও পাথরের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে—ক্ষীণস্রোতা নদীর বক্ষে। স্রোতস্বিনীর মৃদু কল কল ধ্বনির সহিত তাল রাখিয়া ডাকিয়া চলিয়াছে কাঠ-ঠোক্রা পাখীটা। নদীর ওপারে যেখানে দিনের আলোর প্রবেশ-পথ ঘন পাতার আড়ালে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেইখানে দেখা যায়—শাল, সেগুন ও অশ্বত্থ বিরাটাকার দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে,

তাহাদের গোড়ায় আশেপাশে ঘন ঝোপ। অন্ধকারের অস্পষ্টতায় ভয়াল রূপ ধারণ করিয়াছে। আরও নীচে তাকাইলে দেখা যায় সবুজের গভীরতর অন্ধকার গহ্বর হইতে হিংস্র জন্তুর আকস্মিক আবির্ভাব। দৃশ্যটি নিরবচ্ছিন্ন কল্পনাপ্রসূত—তথাপি ভয়াকুল মন মানিতে চাহে না উহা কল্পনা।

অরণ্যের এই ভয়ঙ্কর জীবন্ত ছবি ও অপরূপ আবেষ্টনী তো আঁকিবার উপায় নাই। তুলির টানে গাছ-পাথর-নদী সবই আসিবে, কিন্তু অরণ্যকে ঘিরিয়া যে ভীতির আশঙ্কা জড়াইয়া আছে তাহা কোন্ শিল্পী চিত্রিত করিবে! সেই অজানা স্রষ্টা মহাশিল্পীর কথা মনে আসিল, মাথা নত করিলাম এবং সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা জানাইলাম, "আমার সকল অহমিকা চূর্ণ করে দাও।" আরও কত কথা ভাবিতেছিলাম মনে নাই, আনমনা অবস্থায় কখন সন্ধ্যা পার হইয়া রাত হইয়া গিয়াছিল তাহা খেয়াল ছিল না।

পরের দিন হইতে বিভিন্ন মওড়ায় দুইটি মহিষ বাঁধা হইতে লাগিল; মহিষদ্বয়ের ভিতর লেপার্ডের উচ্ছিষ্টটিও ছিল। মার্কা-মারা চলন্ত "গুড লাক্" সঙ্গে আনিয়াছিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না—এক দিন দুই দিন করিয়া পাঁচ দিন কাটিয়া গেল, বাঘ কোনটাকেই মারিল না। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, উচ্ছিষ্ট পয়মন্ত মহিষটার চতুষ্পার্শ্বেই বড় বাঘ ঘুরিয়াছিল, এমন কি লাফ মারিবার জন্য একবার প্রস্তুতও হইয়াছিল। তাহার পদচিহ্ন ও বসিবার স্থানটি পরীক্ষা করায় উহাই প্রমাণিত হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হয়ত বাঁধা অবস্থায় দেখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ঘটনাটি আশ্চর্য্যজনক হইলেও সত্য।

নিষ্কর্ম্মাভাবে আর কত দিন বসিয়া থাকা যায়! ক্যাম্প তুলিবার আদেশ দিলাম—নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া হাসিলাম। চল্‌তি কথায় একটি প্রবাদবাক্য আছে "কপালে নাইক ঘি ঠক ঠকালে হবে কি?"

পরের দিন সকাল হইতেই মাল তোলার সাড়া পড়িয়া গেল। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছি। এমন সময় কয়েকটি লামবাড়ি আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—সাহেব রক্ষা কর, আমাদের সর্ব্বনাশ হইতে চলিয়াছে। বাঘ একটির পর একটি গর্ভবতী গাভী মারিয়া ফেলিতেছে। কাল রাত্রে দুইটিকে মারিয়াছে এবং একটিকে টানিয়া গভীর জঙ্গলের ভিতর লইয়া গিয়াছে।

লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, আশা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—মাল নামাইবার আদেশ দিলাম এবং সময় নষ্ট না করিয়া লামবাড়িদের সহিত যাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলাম।

অর্দ্ধ ঘণ্টা কালের ভিতরেই আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। পথ চলিতে চলিতে শুনিলাম, আমাদের গন্তব্যস্থল মাত্র ৪ মাইল দূরে; পৌঁছাইয়া বুঝিয়াছিলাম ছয় মাইলের কম হইবে না। গরুটাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে একটু সময় লাগিল, কারণ যেখানে মারিয়াছিল সেখান হইতে প্রায়

তিন ফারলং টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। পিছনটা খাইয়া ফেলায় বাচ্চাটা গর্ভভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া গিয়াছে, আহা কি নধর কান্তি! হয়ত আর কয়েক দিন পরেই ভূমিষ্ঠ হইত।

গরুর নিকটবর্ত্তী স্থানে মাচান বাঁধিবার জন্য একটি উপযুক্ত গাছ খুঁজিতে লাগিলাম—কোথাও পাইলাম না; নিরুপায় হইয়া মাটিতেই বসিব ঠিক করিয়া ফেলিলাম। নিকটেই বাঁশঝাড় ছিল, উহার গোড়ার দিকে নাড়া দিতেই অধিকাংশই ভাঙিয়া গেল। কোনটার গোড়া পচিয়া গিয়াছে, কোনটার শিকড় মাটি ছাড়িয়া দিয়াছে।

গত্যন্তর না থাকায় নকল ঝাড় প্রস্তুতের নিমিত্ত কুলীদের গোড়া হইতে পাতাসমেত বাঁশ কাটিয়া আনিতে বলিলাম, এবং সেগুলি পুঁতিবার জন্য তিন জনকে মাটিতে গর্ত্ত করিতে লাগাইয়া দিলাম। খননকারীদের ভিতর বৃদ্ধটি জুৎসইভাবে সাবোল চালাইতে পারিতেছিল না। তাহার নিকট হইতে লৌহদণ্ডটা কাড়িয়া লইয়া নিজেই খুঁড়িতে লাগিয়া গেলাম—তাড়া ছিল, অপরাহ্নের পূর্ব্বে বসিবার স্থানটি প্রস্তুত হইয়া যাওয়া উচিত। ভিতরকার বাঁধন ইত্যাদি শেষ করিয়া বাহিরে কামুফ্লাজিং দেখিতে আসিলাম। নিকটে গিয়া পিছনে হটিয়া ছবিতে শিল্পীর শেষ পোঁচ লাগানর মত খুঁৎগুলি ঠিক করিয়া দিলাম। এখন কে বলিবে ইহা আসল বাঁশঝাড় নহে। খুশী হইয়া বর্ণবাস সহ ভিতরে ঢুকিলাম এবং প্রবেশ-পথ দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়া দিতে বলিলাম। কুলীর দল ইতিমধ্যে আদেশমত গরুটাকে টানিয়া বিপরীত দিকের বাঁশ-ঝাড়ে বাঁধিয়া দিল। মাত্র কয়েক গজ টানিয়া আনিতে নয় জন জোয়ান কুলী হিম-শিম খাইয়া গেল। তুলনায় বাঘের আসুরিক শক্তির কথা ভাবিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিলাম।

মাথার উপর ঢাকা থাকার দরুন বাহিরের আলো সত্বেও আমাদের বসিবার স্থানটি গাঢ় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, কুলীদেরও গরু বাঁধার পরেই চলিয়া যাইতে বলিয়াছি। ভিতরে টর্চ্চ জ্বালিবার উপায় নাই, অথচ সিগারেটের নেশা আমাকে পাইয়া বসিয়াছে অন্ধকারে মাটিতে বসিয়া আর ধূম পান চলিবে না। প্যাকেটটা পাশেই কোথাও পড়িয়াছিল। হাতড়াইয়া বাহির করিতে গিয়া মনে হইল একটি বহুপদী লম্বা কীট আমার তালুর উল্টা পিঠে উঠিয়া পড়িয়াছে—ভাবিলাম হয়ত বড় কেঁদরাই, কিন্তু বন্দুক রাখিবার ছিদ্রের নিকট হাত আনিতে শিহরিয়া উঠিলাম। একটি বিশালকায় ঘন কৃষ্ণবর্ণ শতপদী বৃশ্চিক! চোখ-কান বুজিয়া হাত ঝাড়িয়া সেটাকে বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। বাহিরে পড়িলেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলাম না আবার যে ফিরিয়া আসিবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি—পর ক্ষণেই মনে হইল ভিতরে যে আরও পাঁচ-ছয়টা নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বৃশ্চিক ছাড়া যদি—আর ভাবিতে পারিলাম না, পালাইবার পথও বন্ধ। ধরিয়া-বাঁধিয়া নিরীহ মহিষকে মাংসভুক্ বাঘের টোপ্ করিবার প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়াছে। সম্ভব-অসম্ভব

অনেক ঘটনার আশঙ্কায় যে সময়টি কাটিল তাহারই ভিতর বাহিরে কখন অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। এমন সময় মাত্র কয়েক হাত দূরে মাটি আঁচড়ানর শব্দ শুনিতে পাইলাম। পরিচিত শব্দ। শব্দকারীকে দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। নিঃশব্দে পাতার আড়াল সরাইতে দেখিলাম—একটি প্রকাণ্ড ভালুক নিবিষ্ট চিত্তে উইয়ের ঢিপি খুঁড়িয়া চলিয়াছে এবং মাঝে মাঝে সনাতন প্রথায় শোষণ দ্বারা দধিভোজনের ন্যায় হুস্‌হাস্ করিয়া গর্ত্তে মুখ লাগাইয়া টান মারিতেছে। বাহিরে অন্ধকার হইয়া গেলেও তাহার ছায়ামূর্ত্তি (silhouette) দেখিতে কিছু মাত্র অসুবিধা হয় নাই। এত কাছে যে, বন্দুক গায়ে ঠেকাইয়া মারা চলে। হাত নিস্‌পিস্ করিতেছিল। এত বড় হিংস্র জন্তুকে এত সুবিধার মধ্যে পাইয়া মারিতে পারিলাম না। বন্দুক চালাইলে বাঘের আশা ছাড়িতে হয়। নিজেকে সংযত করিলাম। অল্পক্ষণ পরে ভালুকটা চলিয়া গেল।

কি অসম্ভব নিস্তব্ধতা, একটি শুকনা পাতা পড়িলে তাহার শব্দ শুনিতে পাইতেছি! হৃদয়ের উপর কে যেন সশব্দে হাতুড়ি পিটিতেছে—বাহিরে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতেছি!—অকস্মাৎ দূরে ফেউ ডাকিয়া উঠিল, বনের রাজার আগমনবার্ত্তা—বাঘ আসিতেছে। ক্রমান্বয়ে সঙ্কেত আরও নিকটে আসিতে লাগিল—পরে আমাদের কেন্দ্র করিয়া ত্রিশ-চল্লিশ হাতের ভিতর চতুষ্পার্শ্বে ডাকিয়া চলিল। তবে কি আমাদের উপস্থিতি বাঘ জানিতে পারিয়াছে?—"কিল"-এর নিকটে আসিতেছে না কেন? আমার অনুমান অহেতুক। সন্দেহের কারণ কিছু থাকিলে ভালুক এত কাছে আসিয়া অতক্ষণ ধরিয়া আপন মনে মাটি খুঁড়িত না। হঠাৎ ফেউয়ের ডাক থামিয়া গেল। আবার সেই ভীতিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। পর-মুহূর্ত্তে সমস্ত বনানী বিকম্পিত করিয়া বাঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত গরুটার উপর লাফাইয়া পড়িল। কি অবর্ণনীয় দৈহিক শক্তি—যেমন লাফাইয়া পড়িল অমনি গরুটাকে একটানে বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া দিল। অধিক কাল অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলাম না। টর্চ্চের সুইচ টিপিয়া দিলাম। দেখিলাম সাক্ষাৎ-মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি আমার সামনে দাঁড়াইয়া আছে! টর্চের আলোয় চোখ দুইটি গোলাকার অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে। রাইফেল তুলিয়া টিপ করিতে যাইব, এমন সময় রিফ্লেক্টর উপর হইতে কোন ওজনের চাপে ধীরে নীচু হইয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ, আলো আমার সাম্‌নে মাত্র দুই হাত দূরে মাটিতে পড়িয়াছে! Flood light-এর ন্যায় রশ্মিচ্ছটা আমার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, বসিবার স্থান ভিতরে আলোকিত হইয়া গিয়াছে, বাঘের দেহ দেখিতে পাইতেছি না, অন্ধকারে মিশাইয়া গিয়াছে, রাইফেলের first sight-এ এতটুকুও আলো নাই, টিপ করিব কেমন করিয়া! মাটি হইতে ঠিকরান রশ্মিতে বাঘের চোখের উপর বিশেষ দিক হইতে উজ্জ্বল আলো না পড়িলে জ্বলে না। যে কারণে তাহার চোখ জ্বলে, সেই কারণে হরিণ, মহিষ, গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ও সাইকেলের পিছন-

দিককার নিরেট লাল কাচের টুকরাও জলে। সত্যটি লিখিয়া কবির কল্পনায় বাধা সৃষ্টি করিলাম—সেজন্য ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। আর একটি সত্য বলিবার আছে—"ট্রাইপ্‌স" নরভুক্, এবং আহত না হইলে কখন দলবদ্ধ মানুষকে আক্রমণ করে না—যাহা অতি চালাক লোকও করিয়া থাকে।

"সাক্ষাৎ-মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি"

মানুষের সামনে বাঘের আচরণ কতকটা প্রাচীনপন্থী নব-বধূর ন্যায়। আত্মগোপন করিতে পারিলেই সে অধিক মাত্রায় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে।

ক্ষণিকের ভিতর আমি উত্তেজনায় মরিয়া হইয়া উঠিলাম। সুবিধা-অসুবিধার কথা

তুলিয়াছি। চক্ষু দুইটির মণিস্থল লক্ষ্য করিয়া আন্দাজে ঘোঁড়া টিপিয়া দিলাম। বাঘ হুঙ্কার দিয়া পলাইয়া গেল—গুলি লাগে নাই; দুঃখে, ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলাম। বালকের ন্যায় কাঁদিতে পারিলে হয়ত সান্ত্বনা পাইতাম। ভাবিলাম, আহত না হইলে বাঘ এইরূপ অবস্থায় কত সময় ফিরিয়া আসে—আজ যে আসিবে না তাহা কে বলিতে পারে! কেন বলিতে পারি না, আশান্বিত হইয়া উঠিলাম।

তখনও টর্চ্চটা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। বাহিরে হাত বাড়াইয়া রিফ্লেক্টর উঠাইবার চেষ্টা করিতেই অনুভব করিলাম উহা আটকাইয়া গিয়াছে। ঠেলাঠেলিতে কোন লাভ হইল না। নীচু হইয়া দেখি—কামুফ্লাজিং নিখুঁৎ করিতে গিয়া বিভ্রাটটি ঘটিয়াছে। উপর হইতে একটি মোটা ডাল নিজস্ব ওজনে ধীরে নামিয়া আসিয়া রিফ্লেক্টরের উপর কায়েমিভাবে চাপিয়া বসিয়াছে। এখন বাহির হইতে ডালটি কেহ সরাইয়া না দিলে আলোর ব্যবহার বন্ধ। বাঘ ফিরিয়া আসিলেও তাহাকে আর মারিতে পারিব না।

বলাই বৃথা, বাঘ আর ফিরিয়া আসে নাই। সারাটা রাত জাগিয়া কাটাইয়া পরের দিনই মাদ্রাজে ফিরিবার ব্যবস্থা করিলাম।

ভাল ছেলে

লালগোপাল যে ভাল ছেলে তাহা স্বতঃসিদ্ধ, কারণ সে আধুনিক প্রথায় টেরি কাটে না, উঁচু নজর নাই, এমন কি সিগারেট পর্য্যন্ত খায় না। মুখশুদ্ধির নিমিত্ত সারাটা দিন ভাজামসলা জাবর কাটার মত চর্ব্বণ করিয়া থাকে। সে কলেজে পড়িতেছে। জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা তাহার সঙ্গত ভাবে উৎকট, হয়তো বা এবার পরীক্ষাটায় পাশই করিয়া ফেলিবে। বৎসরের পর বৎসর সে ফেল করিয়া আসিতেছে, তথাপি তাহাকে বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই; বরং সরস্বতী পূজার চাঁদা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে সঙ্কল্পকে অধিকতর দৃঢ় করিবার জন্য।

গোপাল ভাল ছেলে, ইহা যেমন সর্ব্বসম্মত, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমার ছাপ যে শিক্ষিত সমাজে মিশিবার একমাত্র Passport, তাহাও সর্ব্বজ্ঞাত। এমন অবস্থায় ভদ্রসন্তানের অন্ততঃ আটপৌরে ধরণের বি-এ ছাপটা নামের পিছনে ব্যবহার না করিতে পারিলে চলে কেমন করিয়া? উক্ত যুক্তির বিরুদ্ধে তর্ক নাই; সুতরাং গোপাল যতদিন না পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে ততদিন সে যে

একজন উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যার্থী, তাহা প্রমাণ হওয়া আইনতঃ বন্ধ। এই কারণে ঘরের বাহির হইলেই সে একটি সুদৃশ্য ও পুষ্ট ইংরাজী গ্রন্থ হাতে রাখিত। বলাই বৃথা, যে-সব মনীষীর লেখা বই লইয়া সে নিজের বিদ্যার বিজ্ঞাপন প্রচার করিত, সেগুলির পাঠ্য বিষয় গোপালের নিকট অবোধ্য, কারণ দর্শন অথবা অর্থ-নীতির সে কোনই খবর রাখে না। বাছা-বাছা কয়েকটি পুস্তকের ব্যবহারে ট্রামে ভ্রমণটি একটু বেশী করিয়া হইত। ভাগ্যগুণে সবুজ ও কাঁচার ছোঁয়া লাগা কোন আধুনিক ধরণের মহিলা পাশের সীটে বসিলেই সে কালবিলম্ব না করিয়া চিহ্নিত পৃষ্ঠাটি খুলিয়া ফেলিত। চিহ্নটি চিরস্থায়ী হওয়ায় একই পাতা কতবার যে খুলিয়াছে তাহার অন্ত নাই। পঠনে তাহার নিবিষ্ট-চিত্ততা যতই গাঢ় হইতে থাকিত, ততই তাহার নত দৃষ্টি চঞ্চল হইয়া উঠিত। এই সময় সূক্ষ্মদর্শী কেহ থাকিলে লক্ষ্য করিতেন যে, পুস্তকের হরফগুলি টপকাইয়া সতর্কতা অবলম্বনে আমাদের গোপাল শাড়ীর প্যাঁচের বিশিষ্ট রেখাগুলি দেখিয়া লইতেছে। দৃষ্টি চঞ্চল, সুতরাং একস্থানে নিবদ্ধ থাকিবার কথা নয়—স্যাণ্ডাল ও বিলাতী আলতার (cutex) টিপ ভূষিত নখাগ্রের কারুশিল্প ও তৎসহ নরম আঙ্গুলগুলিও পরীক্ষা করিতে ছাড়িতেছে না। ইহা অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য-বোধের কথা, চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইবার কিছুই নাই।

রক্তরঙে রঞ্জিতনখী মহিলা গোপালের গন্তব্য স্থানের পূর্ব্বে নামিয়া যাইলে বেচারী বইটী বন্ধ করিয়া সামনের দিকে উদাস নয়নে তাকাইয়া থাকিত। অনেক সময় দীর্ঘ নিঃশ্বাসও পড়িতে দেখা গিয়াছে।

এইভাবে সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ গোপালকে কবি-ভাবাপন্ন করিয়া তুলিল। যেদিন তাহার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িয়াছে, সেইদিনই দেখা গিয়াছে সেই অজ্ঞাত বিদুষীকে উদ্দেশ করিয়া সে প্রাণ ভরিয়া শব্দ কণ্ডুয়নে মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল কোন কোন সনাতন প্রাচীনপন্থী সমাজে বিধিমতে বিবাহের পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া পাঠ্যাবস্থায় কবিতা লেখা, সঙ্গীতচর্চ্চা, নভেল পড়া ইত্যাদি লালসা, চরিত্র-স্খলনের পূর্ব্বাভাব বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। গোপালের পিতা অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সেই কারণে উক্তমত দৃঢ় ভাবে সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। পিতার আদর্শানুসারে বাড়ীর গৃহিণী পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠিয়াছেন। নভেল পড়া ত দূরের কথা, তিনি রামায়ণ, মহাভারত পর্য্যন্ত পড়িতে পারেন না ; কারণ বর্ণ-পরিচয়ের সুবিধা তিনি বিবাহের পূর্ব্বে অথবা পরে কখনও পান নাই। এ বিষয়ে ঔদাসীন্য কর্ত্তা ধর্ম্মসঙ্গত মনে করিতেন। অভিজ্ঞতার ফলেই বিশ্বাসটি জন্মাইয়াছিল। ঘটনাটি পুরাতন : কম বয়সে কোন চিঠির আদান প্রদান করিতে গিয়া প্রায় মামলার ফ্যাসাদে পড়িয়াছিলেন ; অপর পক্ষ চিঠির উত্তর দিতে না পারিলে এমনটী ঘটিত না। তদবধি গৃহস্থের মেয়েদের লেখাপড়া শেখটা তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন না।

এদিকে গোপালের দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রায় ক্রনিক ব্যাধিতে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। কবিতা লিখিতে না পারিলে তাহার অম্লশূল দেখা দেয়। কোন কোন ডাক্তারের মতে ইহা খুবই স্বাভাবিক। বয়সের খোঁচা খাইয়া প্রেমের কবিতা অন্তর ফাটিয়া বাহির হইলেই নানা উপসর্গ আসিয়া জোটে, অম্ল কেন?—ভির্‌মি, মাথাধরা, হৃদয়ের ছট্‌ফটানি, উদাসভাব, অবশেষে ক্ষয়রোগও আসিয়া থাকে। প্রধান রোগের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটি মাত্র উপায় আছে, তাহা কবিতাকে solidified করিয়া দেওয়া। শূন্যে ঝোলা কবিতা একটি বিশেষ পাত্রীকে আশ্রয় করিয়া গড়াইতে থাকিলে অনেক সময় contageon nutralised হইয়া যায়। কিন্তু গোপালের কবিতা একটু উর্দ্ধ স্তরের, কোন নির্দ্দিষ্ট নারীকে সে আবেদন জানায় না।

সেদিন দীর্ঘনিঃশ্বাসের প্রেরণা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। দারুণ আবেগ সামলাইতে না পারিয়া সবে গন্ধের কথা পদ্যে লিখিয়া ফেলিয়াছে, এমন সময় পিতা সশরীরে ঘরের ভিতর আবির্ভূত হইলেন। লেখা লুকাইবারও উপায় ছিল না, সদ্য কাঁচা কালী তখনও শুকায় নাই, বেচারা বামাল ধরা পড়িয়া গেল। পিতা খাতাটি তুলিয়া লইয়া রসসৃষ্টির নবজাত exhibit তো পড়িলেনই, অধিকন্তু অভিজ্ঞ দারোগাবাবুর মত অধিকতর seditious কিছু বাহির করিবার প্রথায় গোপালের সামনে দাঁড়াইয়া অন্যান্য পাতাগুলি পরীক্ষা সুরু করিয়া দিলেন। খুঁজিবার আছে কি? সবই তো ঐ। পরীক্ষা শেষ করিয়া পুত্রের আকস্মিক পরিবর্ত্তনে তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। কাগজে-কলমে একি সাংঘাতিক স্বীকারোক্তি। কল্পলোক হইতে অজ্ঞাত কুলশীলাকে আহ্বান! নিকটে ডাকা, পাশে বসান এবং ঘনীভূত ভাবে কত কি!........চরিত্রস্খলনের আর বাকি রহিল কি? হুঙ্কার সহ একটি 'হুঁ' শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক খাতা বগলে করিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং পরের দিনই পাত্রী খুঁজিবার জন্য লোক লাগাইয়া দিলেন—ঘটককে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যেন বাড়ন্ত মেয়ে না হয়। কিন্তু ঘটিল অন্যরূপ।

যে ভাবী বৈবাহিক highest bid ডাকিলেন, তাঁহার কন্যা বেশ ডাগর, তাহার উপর ম্যাট্রিক পাশ করিয়া ফেলিয়াছে। পাশ করা মেয়ে তেমন পছন্দ না হইলেও কর্ত্তা টাকার দিকটা বোঝেন ভাল; সুতরাং বিলম্ব না করিয়া লেখাপড়া-শেখা ডাগর মেয়ের সহিতই পুত্রের বিবাহ দিয়া ছাড়িলেন। শত্রুর মুখে ছাই দিয়া ইহাতে গোপালের চরিত্রস্খলনের দিকে কতকটা বাধা পড়িলেও চরিত্রশুদ্ধিটা পুরাপুরি হইল না। এখন ঠিক শূন্যে ঝুলিয়া না থাকিলে কি হইবে, নববিবাহিত ডাগর বধূর আকর্ষণে গোপালের ভাব-প্রবণতা অধিকতর মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। সময় নাই অসময় নাই, নিজের স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ফরমায় ফেলা

প্রেমের কবিতা সাংঘাতিক রকমের ছোঁয়াচে রোগ; সুতরাং বলাই বাহুল্য, নববধূকে লিখিত চিঠিগুলি পর্য্যন্ত পদ্যে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

গোপালের ভগ্নী স্কুলে পড়ে না, শিব পূজা করে; লোকে বলে বয়সটা বাড়ন্তের দিকে, মনটা বাস্তবিকই উপযুক্ত ভাবে পাকে নাই। ভ্রাতার সহিত কোন একটা কলহের সূত্র অবলম্বন করিয়া বাবাকে বলিয়া দিয়াছিল—'দাদা এখনো কবিতা লেখেন এবং বৌদিকেও ঐরকম কোরে চিঠি পাঠান।'

বার বার ফেল করা তাহার উপর চিঠি! পিতা গোপালের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রায় হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন। নতুন বৌকে লুকাইয়া কি বলে, আবোল তাবোল কিছু লিখিলে চরিত্র-দোষ আসে না সত্য, কিন্তু সব কিছুরইতো রয়-সয় আছে। পরীক্ষা ঘাড়ে করিয়া প্রেম! এ কোন্ দেশী আচার? চক্ষুলজ্জা বলিয়াও তো একটা জিনিষ আছে! এই সূত্রে পাশের বাড়ীর চিরশত্রু বাঁড়ুয্যেদের সেই বিশ্ববকাট জ্ঞানপ্রিয়ের কথা মনে আসিল। তাঁদোড়টা হরদম পাশ করিতে করিতে শিক্ষার চূড়ান্তের জন্য সরকারি বৃত্তি লইয়া বিলাত পর্য্যন্ত পাড়ি মারিল, আর তাহারই সহপাঠী গোপাল সেই যে বি, এ, ক্লাসে আটক পড়িয়াছে আর উঠিবার নামটী নাই! এখন বাঁড়ুয্যেকে এড়াইয়া চলিতে হয়, দেখা হইলেই সব কথা ফেলিয়া পুত্রের গুণকীর্ত্তন সুরু করিয়া দিবে। কেন রে বাপু, অত বাড়াবাড়ি কেন? তোর ছেলের গুণ তোর কাছেই থাক্! আমরা কি তা কেড়ে নিতে গিয়েছি? নানা চিন্তায় পিতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কঠোর হইয়া উঠিলেন এবং নিভৃতে পুত্রকে ডাকাইয়া জানাইয়া দিলেন আসন্ন পরীক্ষার সময় অত ঘনঘন চিঠি লেখা চলিবে না। কাহাকে লেখা চলিবে না উহ্য থাকিলেও গোপাল তাহা বুঝিয়াছিল। দণ্ডটা যথেষ্ট হয় নাই ভাবিয়া জামাই ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণটাও না-মঞ্জুর করিয়া দিলেন।

একদিকে পিতার পীড়ন, অপর দিকে বিরহের প্যাঁচ, লালগোপালের মনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া তাহার আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কেবল সুযোগের অভাবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারে নাই। যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় সঙ্কল্প করিল যা থাকে কপালে, ক্লাসে বসিয়াই সে পত্র লিখিবে—'মরার বাড়া তো গাল নাই,' তাহার জন্য তো সে প্রস্তুত হইয়াই আছে। তাহার সঙ্কল্পে কোনরূপ ভ্যাজাল ছিল না, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য ফলদায়ী হইবার পূর্ব্বেই বিঘ্ন ঘটিয়া গেল।

ঘটনাটি এইরূপ—সেদিন ক্লাসের শেষ বেঞ্চিতে বসিয়া নোট লিখিবার ছলে পরম মনোযোগ সহ প্রিয়াকে সম্বোধন সারিয়া সবে সোজা উচ্ছ্বাসগুলি লিখিতে সুরু করিয়াছে, সেই সময় ডেঁপো-prince বড়াল তাহার নোট লেখার নিবিষ্ট-চিত্ততা দেখিয়া আকৃষ্ট হইল। বলাই বৃথা, বড়াল

গোপালের আকস্মিক বিত্তানুরাগ দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইয়াছিল; কারণ সেও গোপালের মত ক্লাসে প্রাচীন পড়ুয়া। দলের ছেলেরা কোথায় কে কি করিতেছে, সে খবর রাখিত। সন্তর্পণে গোপালের নিকট আসিয়া একটি বিশেষ কৌশলে চিঠির গোড়াপত্তনটা পড়িয়া ফেলিল।

পিতার নিষেধ অনুসারে গোপাল কখন ডেঁপো ছেলেদের সহিত মিশিত না, কিন্তু তাহাদের সাহসকে যে মনে মনে তারিফ করিত না, তাহা নহে। লুকাইয়া অনেক সময় উহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার ইচ্ছাও আসিয়াছে, কিন্তু ধরা পড়িয়া যাইবার ভয়ে আত্মশাসন না করিয়া পারে নাই।

বড়াল এদিকে সম্বোধনের পাত্রীটিকে জানিবার জন্য দারুণভাবে কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে। সে সেয়ানা ছেলে, গোপালকে কয়েকদিনের ভিতর বাগাইয়া ফেলিল, এবং ঘনিষ্ঠতা এমন স্তরেই আনিল যে গোপাল তাহার লেখা চিঠি বড়ালকে না দেখাইয়া ডাকবাক্সে ফেলিত না। বড়ালের সহায়তা পাইয়া গোপাল এখন প্রতিদিন ক্লাসে বসিয়া চিঠি লেখে। বড়ালের-মত-ছেলেও অবাক হইয়া গিয়াছিল: বোকা হাঁদা গোপাল পাত্রী হিসাবে গুণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নিত্য-নূতন বিশেষণগুলি আবিষ্কার করে কেমন করিয়া। যে উদ্দেশ্য লইয়া বড়াল ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিল তাহার কিয়দংশ সফল হইলেও পুরাপুরি সার্থক হইয়াছিল বলা চলে না, কারণ গোপাল নতুন বৌ-এর চিঠি একটিও পড়িয়া শুনায় নাই। বন্ধুত্বের এই সঙ্গত দাবী অস্বীকৃত হওয়াতে বড়াল গোপালকে জব্দ করিবার জন্য দৃঢ়-পরিকর হইয়া উঠিল।

কিছুদিন বাদে দেখা গেল পত্রোত্তর নিয়মিতভাবে আসিতেছে না, এবং সপ্তাহে দুই একটি আসিলেও তাহাতে তেমন রসকস নাই। চিঠির বক্তব্য বিষয়ও অনেক সময় অসম্ভব কথায় পূর্ণ, তদুপরি খামের বহিরাকৃতিতে বলপ্রয়োগের চিহ্ন সুস্পষ্ট—খটকা লাগাইয়া দেয়, কে যেন খুলিয়া পড়িয়াছে। ক্রমে এমন সময় আসিল যখন চিঠি আসা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। বড়ালের সহানুভূতি যেভাবে গোপালকে আশ্রয় দিয়াছিল, তাহাতে ঘনিষ্ট আলাপের পর হইতে সে বড়ালকেই জেনারেল পোষ্ট অফিসে চিঠি ফেলিতে দিত। চিঠি যে বড়াল ইষ্ট সিদ্ধির জন্য সরাইয়া ফেলিতেছিল তাহা গোপাল কল্পনাও করিতে পারে নাই।

আসল কথা, গোপাল মজিয়াছে। পত্রোত্তর না পাইয়া যে সে রাগিয়া যাইবে, সে ক্ষমতাও তাহার নাই। নিজের পৌরুষ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দুই একবার রাগিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সফল হইল কৈ? রাগের পরিবর্তে অভিমানে চোখে জল আসিয়া গিয়াছিল। লেটার বোর্ড প্রত্যহই একবার ক্লাসে যাইবার আগে হানা দিয়া যায়—কিন্তু যাহা চায় তাহার সন্ধান মিলে না।

সে এখন বিশ বাঁও জলে তলাইয়া গিয়াছে। এই বিপদে তাহার একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা বড়াল। তাহাকেও আজকাল বড় একটা ঘেঁষিতে দেখা যায় না।

হঠাৎ গোপাল বুদ্ধির পরিচয় দিয়া ফেলিল। একদিন ক্লাস বসিবার বেশ আগে কলেজে আসিয়া উপস্থিত, এবং সোজা লেটার বোর্ডের দিকে চলিতে লাগিল। দীর্ঘ বারাণ্ডার এক কোণে বোর্ডটি টাঙ্গান। সিঁড়ির চাতাল হইতে বোর্ডের নিকটে মানুষকে বেশ ছোট দেখায়। তিনতলার চাতালে সবে পা দিয়াছে এমন সময় দেখে বড়াল লেটার বোর্ডের নিকট কয়েকটি নতুন ছেলের সহিত একত্রে কি একটা কাগজের টুকরা পড়িতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া হাসিয়া সকলেই লুটাপুটি খাইতেছে। উহারই ভিতর সাবধানী ডেঁপো, গোপালের আবির্ভাব দেখিয়া ফেলিয়াছে। যেমন দেখা অমনি কাগজের টুকরাটি বুক পকেটে রাখিয়া বলিয়া উঠিল—attention এবং আদেশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ছেলেগুলি দুই হাত সোজা ঝুলাইয়া আড়ষ্টভাবে সামরিক প্রথায় দাঁড়াইয়া গেল। বড়াল university corps এর একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি, সুতরাং উক্ত প্রথায় আদেশ দিবার অধিকার তাহার ছিল। Attention বলিয়াই কি থামিল? পর মুহূর্ত্তে বলিল—right about turn, quick march। ছেলেগুলি যেন দমদেওয়া কলের পুতুল। শেষোক্ত আদেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা জড় পদার্থের ন্যায় উল্টাদিকে মুখ ঘুরাইয়া গট্ মট্ খট্ করিতে করিতে সম-তালে পা ফেলিয়া দিগ্বিজয়ীর মত একেবারে ক্লাসের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

তখন ঘণ্টা পড়িতে মাত্র দুই এক মিনিট বাকী। সকলের আচরণে গোপাল প্রথমটা হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সন্দেহের ঠেলা খাইয়া যন্ত্রচালিতের মত লেটার বোর্ডের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। হায়, কোথাও কিছু নাই তো! হতাশ হইয়া ক্লাসে ঢুকিতে যাইবে, পথে দেখিল, ঝক্‌ঝকে মেঝের উপর একটি ছিন্ন সুদর্শন খাম। নীচু হইয়া পরীক্ষা করিতে দেখে, খামে তাহারই নাম লেখা, হস্তাক্ষর সুপরিচিত। যাহা হৃদয়ের অতি নিকটে রাখার কথা, তাহাই অবহেলায় মাটিতে লুটাইতেছে! সত্যই গোপাল এবার সংযম হারাইতেছিল, ভাবিল অধ্যক্ষ মহাশয়কে বলিয়া দিবে, বড়াল তাহার স্ত্রীর চিঠি চুরি করিয়া পড়ে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নালিশ করা চলিল না। কারণ ঘটনাটির গোড়াপত্তন যে ক্লাসে বসিয়াই হইয়াছিল। নালিশ করিলে দুশ্চরিত্র আত্মরক্ষার জন্য যে আরো কিছু বানাইয়া বলিবে না তাহার কি নিশ্চয়তা আছে?

উক্ত ঘটনার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। উপযুক্ত স্থানাভাবে চিঠি লেখা একরকম বন্ধ, তথাপি সে আত্মহত্যা করে নাই, কেবল অন্তরে গুমরাইতেছে। ফলে ভিরমি-রোগের সূত্রপাত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভব্যতার সব রকম restriction এড়াইয়া সে ক্লাসের ভিতরেই চোখ বন্ধ করিয়া হাত পা ছুঁড়িয়া থাকে। রোগটার কথা যথাসময়ে মুখ বদল হইতে হইতে পিতার নিকট আসিয়া

পৌঁছাইল। তিনি বিজ্ঞব্যক্তি, রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কায় গৃহিণীর মারফত জানাইয়া দিলেন, "ওর আর লেখাপড়া করে কাজ নেই ; আমার আপিসে বসিয়া ব্যবসায়ে সাহায্য করুক।" তাঁহার বয়স হইয়া আসিতেছে, এখন হইতে দেখিয়া শুনিয়া লওয়া দরকার। কলেজই যখন ছাড়ান হইতেছে তখন বৌমাকে বাপের বাড়ীতে ফেলিয়া রাখার কোন অর্থ হয় না। তাছাড়া গৃহিণীরও তো সেবার প্রয়োজন আছে। আদেশমত গোপাল লেখাপড়ায় ইস্তফা দিল এবং পিতা শুভদিন দেখিয়া নিজে গিয়া পুত্রবধূকে ঘরে আনিলেন।

গৃহকর্ত্তা পুত্রের পাশ করা বাজিতে হার স্বীকার করিয়া পাশের বাড়ীর বাঁড়ুয্যের সহিত ভাব করিয়া ফেলিয়াছেন তবে চরিত্র সম্বন্ধে কথা উঠিলে গোপালকে আধুনিক যুগে আদর্শ পুরুষ বলিতে এখন পিছ্‌পাও হন না। বড়াই করিবার এখন ঐটুকুই সম্বল। ইতিমধ্যে গোপালের ভগ্নীর কোন এক দূরদেশে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আপদ গিয়াছে—গোপাল এখন অনেকটা নিষ্কণ্টক। তাহার উপর কলেজ ছাড়িয়াই বাবার আফিসে একেবারে হুকুম করিবার গদিতে বসিতে পাইয়া কিছুদিন হইতে সে নিজেকে লায়েক ভাবিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের পিছনে আরো একটি কারণ ছিল, তাহা মাসান্তে গোপালের পকেট খরচার টাকা। সুতরাং একটু বেপরোয়া ভাব না আসিলেই বরং অস্বাভাবিক হইত। নতুন আবহাওয়া বরদাস্ত করিতে না পারিয়া সেদিন সে এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিল যে লিখিতে সঙ্কোচ আসে : কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া সকলের সাক্ষাতেই স্ত্রীকে এক গ্লাস জল আনিতে বলিয়া দিল এবং জল লইয়া আসিলে তাহার সব কয়টা আঙ্গুল স্পর্শ করিয়া গেলাসটী গ্রহণ করিল। ভাগ্যগুণে সেখানে বধূর খাশুড়ীঠাকুরাণী উপস্থিত ছিলেন না, থাকিলে কি ভাবিতেন কে জানে? এ সংসারে বয়স প্রৌঢ়ত্বের গা-ঘেঁসা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন বৌ সাক্ষী রাখিয়া স্বামীর সহিত রাত এগারটার আগে বাক্যালাপ করেন নাই। সেই সংসারেরই গোপাল অনাচারটি ঘটাইল এবং দুষ্কৃতির জন্য কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিল না। মাংসাল চেনা দেহীর বিধিসঙ্গত সান্নিধ্যে সে কবিতা লেখাও ছাড়িয়াছে, তদুপরি ভির্‌মি রোগের উৎপাতও নাই। সংক্ষেপে গোপাল আর সে গোপালটি নাই। সে বুদ্ধিমান হইয়া উঠিয়াছে। কবিতা না লিখিলেও মাঝে মাঝে ভাবপ্রণতা তাহার মস্তিষ্ককে ভর করিয়া বসে। সেই কারণে পিতা আফিস বন্ধ করিবার খানিকটা আগে তাহার মাথা ধরে এবং সকাল সকাল বাড়ী ফিরিতে হয়।

সেদিন ভাবের ঘোরে মাথা ধরাইয়া বেশ বেলা থাকিতেই বাড়ী ফিরিয়াছিল। রগ টিপিতে টিপিতে তিন তলায় নিজের নিরিবিলি ঘরটিতে গিয়া দেখে প্রত্যাশিত প্রাণীটি সেখানে নাই। অগত্যা বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল যদি ভাগ্যগুণে দেখা হইয়া যায়। বিপরীত মুখে বারান্দায় ফিরিতে দেখিল মায়ের ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ অর্থাৎ তিনি এখন শীতলপাটি লইয়াছেন, বধূমাতার

নিকট সেবা গ্রহণের জন্য। বধু নিশ্চয় পদমর্দ্দনে ব্যস্ত অথবা মাথার পাকা চুল কাঁচা হইতে পৃথক করিবার চেষ্টা চালাইয়াছে। ইহা অসাধ্য সাধন হইলেও বৌকে চিঠি লেখা এবং নভেল পড়া হইতে বিরত করার মস্ত বড় সহায়ক।

ঘনঘটা করিয়া বৈকাল নামিয়া আসিয়াছে অথচ বৌ মায়ের ঘরে বন্দিনী, এখন সে করে কি? একেলা তো এমন সময় ঘরে বসিয়া থাকা যায় না। কলিকাতার ঘেঁসাঘেঁসি বাড়ী, তদুপরি সময়টা অপরাহ্ন পার হইতে চলিয়াছে,—এই সময় তিন তলার বারাণ্ডায় দাঁড়াইলে যে-কোন রসিকের মন উস্‌খুস্‌ করিয়া থাকে। কবি-প্রাণের কথা তো স্বতন্ত্র। গোপালের দৃষ্টি খোলা ছাদ ও ভেজান জানালার দৃশ্য পরিবর্ত্তন করিতে করিতে একটি আধুনিক ধরণের উন্মুক্ত গরাদে-হীন গবাক্ষে আটকাইয়া গেল। গোপালের ভিরমি রোগ হইলে কি হইবে, তাহার চোখ খারাপ হয় নাই। সে যাহা দেখিতেছিল তাহা ঠিকই দেখিতেছিল, তবে দেখাটা নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ধরণের, —সোজা কথায়, কৌতূহল চরিতার্থ, তদপেক্ষা জটিল কিছু ছিল না! গোপাল দেখিতেছিল একটী গৌরবর্ণা সুন্দরীর প্রসাধন, তাহাও প্রতিবিম্ব, দর্পণ হইতে বিক্ষিপ্ত, সাক্ষাৎ দৃষ্টির ছোঁয়া লাগে নাই। সময়টা সৌন্দর্য্যচর্চ্চায় কাটিতেছিল ভাল, হঠাৎ কি কারণে মহিলাটি দিনের বেলাতেই ঘরে আলো জ্বালাইয়া জানালাটা যেন রাগ করিয়াই বেশ জোরে বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহার পরেই অভ্যাস দোষে গোপালের দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। গৌরবর্ণের উত্তাপে সে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কবির বহুরূপী পিপাসা কি শুধু জলেই নিবারণ হয়? নীচে কলতলায় তাকাইয়া দেখিল নতুন ঠিকা-ঝি বাসন মাজিতেছে। মার্জ্জিত পাত্রগুলি পৃথক করিয়া রাখার সময় ঠুং ঠুং করিয়া আওয়াজ হইতেছিল, যেন সুর বাঁধা হইতেছে। জীবনে গোপালের কখন সুর বা সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ আসে নাই; তথাপি ঠুং ঠাং সুরের মোহে সে নীচু দিকে তাকাইল।

ঝির বয়সটা করকরে কাঁচা, যাকে বলে সোমত্ত। জাতে অস্পৃশ্যা, তার উপর শাড়ী ও গহনার বাহারও একটু কেমনতর। ছোঁয়াছুঁতের ভয়ে কর্ত্রী ঠাকুরাণী তাহাকে পৈ পৈ করিয়া বারণ দিয়াছিলেন, "খবরদার, কর্ত্তা আর দাদাবাবুর ঘরে ঢুকিস্‌ না, ওরা পুরুষ মানুষ ছোঁয়াছুঁত মানতে পারে না। বাসন মাজা হলে বাপু তুই চৌবাচ্চার উপর রেখে যাস, হরেকেষ্ট আবার ধুয়ে হেঁসেলে তুলবে'খন।"

গোপাল শুধু দৃষ্টি দ্বারা বাসন মাজার তত্ত্বাবধানে সন্তুষ্ট হইলেই পারিত, কিন্তু জল তেষ্টার কথা সে ভুলিতে পারিল না। নেপথ্যে বলিয়া উঠিল, "এক গ্লাস জল।"

মাতা সবে তখন নিদ্রার ঘোর কাটাইয়া আর একবার পাশমোড়া দিয়াছেন, এমন সময় পুত্র জল চাওয়াতে তিনি তাড়াতাড়ি হাঁকিয়া বলিলেন, "ওরে হরেকেষ্টো, গোপালকে জল দেরে।" হরেকৃষ্ণ তখন আড্ডা হইতে ফিরে নাই।

নেপথ্যে জল চাওয়াটা ঝি শুনিয়াছিল কিন্তু তাহার উপরে উঠা নিষেধ। দাদাবাবুর সুবিধার জন্য একটি গেলাস পৃথক ভাবে রাখিয়া ধীরে শ্লথবস্ত্র সংযত করিয়া লইল। হয়তো বা দাদাবাবুর দিকে তাকাইয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়াও ছিল। মাতা হরেকৃষ্ণের সাড়া না পাইয়া নিজেই বেতো পায়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাহিরে আসিলেন এবং যা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই দেখিলেন—ঝি উপর দিকে তাকাইয়া অযথা বস্ত্র সংযত করিতেছে এবং ঐ না কে বারাণ্ডার কিনার হইতে দ্রুত সরিয়া গেল? তিনি মনে মনে ভাবিলেন, সময় মত এসে পড়েছি; তা না হলে আর রক্ষা ছিল! বৌমার নিকট ঘটনাটি গোপন রাখার উদ্দেশ্যে মনের অগুনে ছাই চাপা দিবার চেষ্টা করিলে কি হইবে—রক্তমাংসের শরীর তো বটে! একে বাতের বেদনা তাহার উপর অশুচিতাপূর্ণ দৃশ্য। কর্ত্রী ঠাকুরাণী রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে একেবারে নীচের তলায় নামিয়া আসিয়া ঝিকে রোয়াকের আড়ালে ডাকিয়া গলার স্বরকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁলা, তোকে না আমি পৈ পৈ করে বারণ করেছিলুম! হতচ্ছাড়ী, মুখখাকী, তোর এই অনাছিষ্টি কাণ্ড, অ্যাঁ? উনি আসুন, আজ তুই আছিস কি আমি আছি; দেখিস তোর কি অবস্থাটা করি!" তিরস্কারকালীন তাঁহার গলার আওয়াজ যে ধাপের পর ধাপ উঠিয়া পড়িতেছিল সেদিকে তাঁহার খেয়াল ছিল না।

নীচে গোলমাল শুনিয়া বৌ-ও নামিয়া আসিলেন। ঝির শাসন শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী পুত্রবধূর আড়ালে সারিয়া লইবেন ঠিক করিয়াছিলেন, এমন সময় ঘটনাস্থলে তাঁহারই আবির্ভাব। ঝি এতক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন একটা ভাবিয়া লইতেছিল। কলিকাতার ঠিকা-ঝি, অনেক সময় মাছও বেচে এবং গৃহস্থের বাড়ীতে কাজও করে। উপায়ের দিক তাহার বহুমুখী। সে কেন মুখ ঝামটানি সহ্য করিবে? বাবুদের মেসে ঢুকিলে তাহার আয় বাড়িবে বই কমিবে না। সে এবার নথ নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, কি গো মা ঠাক্‌রুণ—আমি কি দোষটা করনু শুনি?

শ্বাশুড়ী—কেন তোকে পৈ, পৈ কোরে বারণ করিনি--হতচ্ছাড়ী কোথাকার!

ঝি—বারণ তো করেছিলে বাবুদের ঘরে ঢুকতে, আমি কি—

শ্বাশুড়ী সামান্য দাসীর কথা কাটাকাটি সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার উত্তরের মাঝখানেই তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—আবার মুখের উপর তর্ক! দোষ ক'রে আবার চালাকি; যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! একি কাণ্ড বলত বৌমা?

দাসী সোজা বলিয়া দিল—ভারি তো সব বাবু,—এই রইল তোমার কাজ, একি ভদ্রলোকের বাড়ী! এ রকম ছাইয়ের কাজ আমার ঢের জুটে যাবে, এই আমি চললুম। কথাটা শেষ করিয়া সত্যই সে অমাজা বাসনগুলি ফেলিয়া গজ্ গজ্ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

পুত্রবধূর নিকট কিছুই গোপন থাকিল না।

পৈ, পৈ করিয়া বারণ করা সত্বেও,—অর্থাৎ এইরূপ ঘটনা বিবাহের পূর্বে কতবার ঘটিয়াছে ঠিক নাই। সাধে কি চিঠি লিখিলে উত্তর আসে নাই। বিবাহের পূর্ব্বে যাহা হউক করিয়াছেন, কিন্তু এখনও ঐ সব নোংরা অভ্যাস ছাড়িতে পারেন নাই। বধূ লজ্জায় ঘৃণায় মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন।

শ্বাশুড়ী ইহা লক্ষ্য করিয়া পুত্রকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য বলিয়া ফেলিলেন—অমন মুখ গোঁজ ক'রে থেক না বাপু, বৌমা। পুরুষ মানুষের ছোঁয়া-ছুঁতে অত দোষ ধরতে নেই। কথাটা যে ভাবেই বলুন উদ্দেশ্য ছিল ঘটনাটি লঘু করা, কিন্তু ফল হইল ভিন্নরূপ। পুত্রবধূর সন্দেহ গাঢ় হইয়া পাকা ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া গেল।

দুই চার দিন পরের কথা—বধূমাতা বাপমায়ের খবর লইবার জন্য শ্বাশুড়ী মারফতই লিখিত একটি পত্র পিত্রালয়ে পাঠাইয়া ছিলেন। পত্র প্রাপ্তির পর বেশীদিন যায় নাই—আসন্ন-প্রসবা কন্যার শুশ্রূষার নিমিত্ত পিতা আসিয়া কন্যাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। যথা সময় নাতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু বৈবাহিক নানা অজুহাতে কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতে বিলম্ব করিতেছিলেন। ইহাতে ছেলের বাপের আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। অনুসন্ধান করিতে করিতে সব ঘটনা শুনিয়া শ্বশুর রূঢ়স্বরে বলিয়াছিলেন, "কি লিখতে কি লিখেছিল তার কিছু ঠিক আছে? নভেল পড়া মেয়ে আর কত ভাল হবে? চুলোয় যাক্, ছেলের আবার বিয়ে দেব।"

উক্ত মন্তব্য কখনই তিনি প্রকাশ করিতেন না, যদি তিনি জানিতেন লালগোপাল ফুটবল ম্যাচ দেখার অজুহাতে প্রত্যহ শ্বশুরবাড়ী যায় এবং প্রিয়ার মানভঞ্জনের পালা শেষ করিয়া শ্বাশুড়ীর স্বহস্তে প্রস্তুত নানা মিষ্টান্নে শূন্য উদর পূর্ণ করিয়া নিতান্ত ভাল ছেলেটীর মত বাড়ী ফিরিয়া আসে।

সাধে কি বলে, "স্বভাব যায় না মোলে, ইল্লোত যায় না ধুলে"! প্রবাদ বাক্যটী যে সত্য তাহা আমাদের ভালছেলে লালগোপাল প্রমাণ করিয়া ছাড়িল।

রাতের বাজার

শীতকাল। রাত একটা বাজিয়া গিয়াছে। কনকনে ঠাণ্ডায় হাড়ের মজ্জা পর্য্যন্ত জমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ছিন্ন কোটের উপর তালি দেওয়া গুনচট, চটের দুইটি প্রান্ত বক্ষের উপর একত্রিত করিয়া সেটাকে র‍্যাপারের মত ব্যবহার করিবার চেষ্টায় ছিলাম। গুনচটটা লম্বায় ছোট। দুপুরবেলা ডাস্টবিন হইতে কুড়াইয়া লইয়াছিলাম, তখন সমস্ত দেহ আবৃত হয় কি না মাপিয়া দেখা হয় নাই। এখন বহু চেষ্টার পরেও দুইটি প্রান্তের মিলন ঘটাইতে পারিলাম না। গুনচট—রবারও নয় পশমও নয় যে, ইচ্ছা করিলেই টানিয়া লম্বা করিয়া লওয়া যাইবে। হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলাম, দুই হাতে দুইটি কোণ পাঁজরার যথাসম্ভব নিকটে আনিয়া চিৎপুর রোডের দিকে চলিতে লাগিলাম।

গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে ; কিন্তু ঘন কুয়াশা, অতি নিকটের বস্তু কিছুই স্পষ্ট দেখিবার উপায় নাই। দোকানপাট সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কেবল পানওয়ালাকে দেখা যায়, জাগিয়া আছে। ব্যবসা তাহার শুধু পান বেচা নয়, জলসা-ঘর সম্বন্ধে সদুপদেশ দিতে সে অদ্বিতীয়। উপযুক্ত দক্ষিণা পাইলেই সে বলিয়া দেয়, কোন্ বাড়িতে কোন্ জাতীয় নূতন জীব আসিয়াছে, এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বৃত্তান্ত তাহার নখদর্পণে।

মারোয়াড়ীরা পুণ্যসঞ্চয় করিয়াই জীবন কাটায়। পরকালের সুব্যবস্থার জন্য স্বর্গদ্বারীদের যে ঘুষ দেয়, তাহার অন্ত নাই। সন্ধ্যার প্রারম্ভে এইরূপ একটি ঘুষের ব্যবস্থা হইয়াছিল—পুত্রের বিবাহোপলক্ষ্যে কাঙ্গালী-ভোজন। আমি ঘুষবহনকারীদের মধ্যে একজন হইয়া গেলাম। রাস্তার ধারে পাতা পাড়িয়া বসিয়া পড়িলাম। খাইয়াছিলামও পরম পরিতোষের সহিত। পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়াটা আমার মত প্রাণীর পক্ষে বিলাসের ব্যাপার। আহারের পরেই আলস্য আমাকে কাবু করিয়া ফেলিল। সত্য কথা বলিতে হইলে আমার দলের মধ্যে আমি একটু আয়েশ বিলাসী, একটু শিক্ষিত এবং একটু মার্জ্জিত। আমার দলের মানুষরা অন্তত আমাকে উক্ত গুণসম্পন্ন বলিয়াই ভাবিয়া থাকে। আভিজাত্যকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিলাম না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটি দেড় হাত প্রস্থ রোয়াক খুঁজিয়া বাহির করিলাম। তাহার উপর আমার নবাবিষ্কৃত মূল্যবান র‍্যাপারটি বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

বেশ খানিকটা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, প্রিয়া আমাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছে। স্বপ্নের স্পর্শ বাস্তবে অনুভব করিতে লাগিলাম।

ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিতে দেখিলাম, সত্যই একটি জীবন্ত প্রাণী আমাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া আছে। হাতটা অকস্মাৎ তাহার গালে লাগিয়া গেল; কি সর্ব্বনাশ, গণ্ডে তো মসৃণ মাংসের স্পর্শসুখ পাইতেছি না! গাল যে কর্কশ! চোখটা সম্পূর্ণ খুলিয়া ফেলিতে দেখিলাম, যিনি আমাকে প্রেম নিবেদন করিতেছিলেন, তিনি নারী নহেন, একটি গোঁফদাড়িযুক্ত পুরুষমানুষ। ধস্তাধস্তি করিয়া তাহার বাহুবন্ধন হইতে কোন প্রকারে মুক্ত হইতেই মনে হইল, উন্মুক্ত বাম হস্তটা সিক্ত, রীতিমত ঠাণ্ডা। পরীক্ষা করিতে দেখিলাম, লোকটা মনের সাধে হাতের উপর বমন করিয়াছে। তাড়ি ও অজীর্ণ অন্নের উৎকট গন্ধে অস্থির হইয়া উঠিলাম। মনে মনে বলিলাম, মানুষটা ছোটলোক। ছোটলোকের সহিত বচসা করিয়া লাভ নাই, তাই তাহাকে ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম। উঠিয়া পড়া সোজা, কিন্তু এত রাত্রিতে হাত ধুই কোথায়? কলেও জল নাই। আমার অবস্থার মানুষের উপস্থিতবুদ্ধি ছাড়া এক মুহূর্ত্তও বাঁচা চলে না। চলিলাম শাল-ধোলাইওয়ালার দোকানের দিকে। রং পাকা করিবার জন্য উহারা রাত্রিতেও শিশিরের মধ্যে রঙিন কাপড়, শাল, দোশালা টাঙাইয়া রাখে।

এই অঞ্চলের আটঘাট সবই আমার জানা। দোকানের সম্মুখে পৌছিয়া চতুর্দ্দিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলাম, বিপদের আশঙ্কা তেমন নাই। রাস্তার উপর রঙিন কাপড় শাল ইত্যাদি ঝুলিতেছে; যেটিকে সামনে পাইলাম, সেইটির দ্বারাই হাত মুছিয়া ফেলিলাম; তাহার পর আবার বড় রাস্তার দিকে ফিরিলাম। বমন শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে, হাতও চটচটে হইয়া উঠিয়াছে। চটচটে হইয়া উঠুক তাহাতে ততটা অসুবিধা ছিল না, দুর্গন্ধটা মারিতে পারিলেই বাঁচিতাম। যে মানুষটি প্রিয়ার স্থান অধিকার করিয়া দুষ্কীর্ত্তিটি করিয়া গেল, তাহার কি হইল জানিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না, কারণ এইরূপ ঘটনা নিত্যই দেখিয়া থাকি। হয়তো সে এতক্ষণে কোন গভীর পাঁকযুক্ত নর্দ্দমায় পড়িয়াছে।

তাহার কথা ভাবিয়া লাভ নাই। আমি আবার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলিলাম, কারণ চলাই আমার ধর্ম্ম, আমার পেশা, এবং আমার জীবিকা-উপার্জ্জনের অবলম্বন।

চলিতে চলিতে বীডন স্কোয়ার পার হইয়া একেবারে খান জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, যাহাকে বলে—রাতের বাজার। এখানে বিড়ি মুখে না থাকিলে মানায় না, কালীঘাটে যেমন কপালে একটি সিন্দুরের টিপ না থাকিলে মানুষ অধার্ম্মিক ভাবিয়া থকে। বিড়িওয়ালার দোকান হইতে যে একটি সরাইয়া ফেলিব তাহারও উপায় নাই, কনস্টেব্‌লগুলি এখানে সর্ব্বদাই জাগ্রত। পরের ধন না-বলিয়া লই বা না-লই, আমার মত জীব দেখলেই ইহারা তাড়া করিয়া থাকে। কেন বলিতে পারি না কনস্টেব্‌লগুলি আমার চক্ষুশূল, কখনও উহাদের পছন্দ করিতে পারিলাম না!

এখানে সকলেই যে যাহার নিজের ফন্দিতে ঘুরিতেছে—পকেটমার, গাঁটকাটা, ধড়িবাজ, দালাল, পানওয়ালা দি ব্যাঙ্ক, সকলেই নিজের ব্যবসা পাহারাওয়ালার চোখে ধূলি দিয়া গুছাইয়া লইতেছে। আর আমি একটি বিড়ি সরাইলেই তাড়া করিয়া আসিবে কেন? এ কেনর উত্তরই বা দিবে কে?

অর্থনীতির কত রকম ভাষ্য বিদেশীদের অনুকরণে স্বদেশীয়েরা করিয়া চলিয়াছে, তাহারা কি আমার মত জীবের কথা ভাবিয়াছে? তাহারা মাথা ঘামাইতেছে চাষার জন্য। তাহাদের ভালরকম ব্যবস্থা করিতে গিয়া জমিদারকে জখম করিবার জন্য দৃঢ়পরিকর হইয়াছে। আরে বাবা, জলসাঘর বাঁচিয়া আছে কেবল বনিয়াদী জমিদারের জন্য, আমরা বাঁচিয়া আছি জলসাঘরের ভোগের প্রাচুর্য্যের জন্য! লোহাওয়ালা টাকা করিয়া 'সার্' খেতাব পাইলেও সে ভগ্নাংশের হিসাব করিয়া নিমন্ত্রিতদের খানার হিসাব দেয়, প্রাচুর্য্যের স্থান সেখানে নাই! উহারা 'সার্' হইলে কি হইবে, জন্মিয়াছে খাতার হিসাব রাখিবার জন্য! জন্মগত দৈন্যের প্রভাব ও আবেষ্টনী-উদ্ভূত প্রকৃতি পাশ কাটাইয়া কত আর উদার হইতে পারে? হিসাবের বাহিরে খরচ হইলেই কলিজা ফাটিয়া যাইবে, মাঝখান হইতে আমরা পরিত্যক্ত প্রাচুর্য্যের অংশ হইতে বঞ্চিত হইব। আমরা বলি, চাষাও বাঁচুক, জমিদারও বাঁচুক, আমরাও একটু খাইতে পাই।

এখানে শুধু পাহারাওয়ালা জাগিয়া থাকে না। সকলেই যে যাহার নিজের ফন্দিতে ঘুরিতেছে। কর্ম্মব্যস্ততার দিক দিয়া বড়বাজার অথবা শেয়ার-মার্কেট এই স্থানটির তুলনায় নগণ্য। রিক্শ-ওয়ালা এদিক ওদিক সওয়ারী লইয়া ছুটিয়াছে। সওয়ারীর ভিতর কেহ নিঃসম্বল হইয়া ফিরিতেছে, কেহ সর্ব্বস্ব দিবার জন্য চলিয়াছে। এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, ইহার ভিতর নূতনত্ব কিছুই নাই।

দুই পয়সার বিড়ি কিনিতে যাইতেছিলাম। পাহারাওয়ালাকে দেখিয়া খরচটা সংযত করিয়া ফেলিলাম। একসঙ্গে দুই পয়সার বিড়ি কিনিলেই কর্ত্তব্যপরায়ণ মানুষটি গাঁট কাটিয়াছি বলিয়া সন্দেহ করিয়া বসিবে। সন্দেহ করিয়া যদি আইন মানিয়া চলে তো বাঁচিয়া যাই, হাজতে বাস তো আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়, দুই বেলাই খাইতে পাইব। হাজতে না লইয়া, ইচ্ছামত ঘা কতক বসাইয়া ছাড়িয়া দিবে। কেন রে বাপু, আমরা কি বেকার? গাঁট কাটাও ঠিকমত শিখিতে হইলে রীতিমত সাধনার প্রয়োজন হয়।

লোকটা আবার আমার দিকেই ফিরিয়াছে। কি আর করি, একটা পয়সা বাহির করিয়া পানওয়ালাকে ফরমাশ করিলাম, এক আধেলেকা বিড়ি আউর আধেলেকা পান।

পান মুখে পুরিয়া বিড়ি ধরাইলাম। অ্যাঃ, বেটা ঠকাইয়াছে। এত বড় দোকান, এক পয়সার বিড়িতেও ঠকাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না! ছোটলোক কি আর গাছে ফলে!

আমারও রাগিবার অধিকার আছে। পয়সা দিয়া জিনিস কিনিয়াছি, ঠকাইলেই মানিব কিনা! পাহারাওয়ালা ও পানওয়ালার তখন রসিকতা চলিতেছিল। যে.উৎসাহ লইয়া রাগটা প্রকাশ করিয়া ফেলিব ভাবিয়াছিলাম, তাহা হইল না। অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিলাম, ওস্তাদ, বিড়িটা যে একটু কেমনতর, বদলে দেবে না?

অভিযোগ শুনিয়া এক তাড়া পান জলে ডুবাইয়া সে আমার মুখের উপর ছিটাইয়া দিল। ঠাণ্ডা জলের বিন্দুগুলি মুখের উপর সূচের মত বিঁধিয়া গেল। অভিযোগের বিচার চরম হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিতের মর্য্যাদা মূর্খে বুঝিবে কেমন করিয়া?

মূর্খের দলকে ছাড়িয়া বিনাবাক্যব্যয়ে স্থানটি ত্যাগ করিলাম। আমি জানি, আমার এই আত্মসংযমের দৃষ্টান্তটি কোন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইবে না, কিন্তু সদ্‌গুণের সুবিচার হইবার সম্ভাবনা থাকিলে বলিতাম, আমি ধর্ম্মপ্রচারকদের অপেক্ষা কম কিসে? ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা প্রচারের জন্য আমি কোন্ কষ্ট সহ্য না করিয়াছি? নিজের দলের ব্যবসা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কতবার মার খাইয়া অজ্ঞান পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছি, খালি জেলে যাই নাই। জেলে যাই নাই বলিয়াই কি আমার গুণের, আমার সৎসাহসের আদর হইবে না?

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর দল শত শত বৎসর ধরিয়া বংশবৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে। ঘটনাচক্রের ফলে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মভুক্ত মানুষের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। আমার দলে না হয় লোক কম, মাত্র কয়েকজন; কিন্তু কে বলিতে পারে, দূরভবিষ্যতে আমার মত নির্গুণ ভবঘুরের সংখ্যা বাড়িয়া উঠিবে না? কে বলিতে পারে, ভদ্রবেশী নীতিবাদীদের ভিতর শত-করা দশজন আমারই মত দিবারাত্র গাঁট কাটিবার কথা ভাবিতেছে না? প্রকাশ্যে তাহারা যোগ না দিক, তাহারা আসলে গাঁটকাটা।

কতকগুলি আমার মত জীব বাঁচিয়া না থাকিলে সাধুরা মহাপুরুষ বলিয়া প্রমাণিত হইবে কেমন করিয়া? অন্ধকার আছে বলিয়াই আলোকের বৈশিষ্ট্য বুঝি। সুতরাং সাধুর মতই আমাদেরও জগতে বাস করিবার অধিকার আছে।

উচ্চ যুক্তি ভাবিয়া বেশ আত্মতুষ্টি বোধ করিতেছিলাম। অনেকটা পথ চলিয়াছি, চলিতে চলিতে শরীর উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, গুনচটের র‍্যাপারটা কাঁধের উপর ফেলিলাম।

যেমন ফেলিয়াছি অমনই মুহূর্ত্তে সেটি অপসারিত হইয়া গেল, ভোজবাজির খেলার মত। বুঝিলাম, কোন ঐন্দ্রজালিক পিছু লইয়াছে। এ রাস্তায় নানা স্তরের নানা দলের ঐন্দ্রজালিক ছদ্মবেশে বিচরণ করিয়া থাকে। তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়া দেখিলাম, পয়সাগুলি ঠিক আছে। হাত পকেটেই রাখিয়া পিছন ফিরিলাম। দেখিলাম, একটি গলিতকুষ্ঠ আমার মূল্যবান র‍্যাপারটা

বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। তাহার নিকট হইতে অপহৃত বস্তুটি যে কাড়িয়া লইবার উপায় নাই, তাহা সে জানিত। যে হাত দিয়া সে র‍্যাপার সরাইয়াছিল, তাহাতে তালু ছাড়া আর কিছু নাই, আঙুল সব খসিয়া গিয়াছে। বংশদণ্ডের ডগার সাহায্যে কোন বস্তু উত্তোলন করিবার পন্থায় সে গুনচটটি সরাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহাকে কিছুক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিলাম, একেবারে বেপরোয়া। মারেরও ভয় নাই, কারণ হাত দিয়া তাহাকে কেহ মারিতে সাহস পায় না।

আমি কিছুই বলিলাম না। বলিবার এবং করিবার আছে কি? শীতের তাড়না হইতে আমি কতকটা বাঁচিয়া গিয়াছি, কিন্তু গুনচটের বর্ত্তমান মালিক যে, সে প্রায় দিগম্বর। শীতে কুঁকড়াইয়া গিয়াছে, ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে, মারাত্মক শীত উন্মুক্ত চামড়াকে আরও ফাটাইয়া দিতেছে।

লোকটা আমার সামনে আমার র‍্যাপার দিয়া দেহ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। কঙ্কালসার শরীর, সমস্তটা আবৃত করিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না। আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। হাসির মধ্য দিয়া হয়তো আমাকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল, 'গুনচটের প্রয়োজন তোমার অপেক্ষা আমার অনেক বেশি। তোমার পক্ষে উহা শৌখিনতা, আমার পক্ষে বাঁচিয়া যাইবার অবলম্বন, আমার চামড়া যে ফাটা।'

র‍্যাপার সহ ঐন্দ্রজালিক চলিয়া গেল। ক্লান্তি বোধ করিতেছিলাম, পছন্দসই একটা রোয়াক খুঁজিতে লাগিলাম। আমার শৌখিনতাই আমার জীবন-ধারণের অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে সেখানে শয়ন তো দূরের কথা, বসিয়া বিশ্রাম করিতেও অসুবিধা বোধ করি। মূর্খ ও অভদ্রের সান্নিধ্য আমার নিকট অসহ্য। সুতরাং এমন একটি স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, যেখানে উপরিবর্ণিত জীবদের আবির্ভাবের সম্ভাবনা কম। সারাটা জীবন ধরিয়াই এমন একটি স্থান খুঁজিতেছি, পাইলাম কই?

অতি বিলম্বে একটি মনোমত রোয়াক পাইয়া গেলাম। চমৎকার, ছোট্ট হইলেও চমৎকার! একেবারে নিরিবিলি। পাশের ঘরটিতে বোতল খোলার আওয়াজ শুনিলাম, উপরতলায় সামনের ঘর হইতে হারমোনিয়ামের প্যাঁ-পোঁ আওয়াজ আসিতেছে। সমঝদারের বিকট বাহবার আওয়াজে সুর আর শোনা যাইতেছে না, ফুটবল-খেলায় গোল দিবার সময়ে যে আওয়াজ হয়, ঠিক সেই জাতীয় কোলাহলে সুর জমিয়া উঠিয়াছে।

চতুর্দ্দিকে একবার তাকাইয়া লইলাম। আতঙ্কের কারণ কিছু দেখিলাম না। একটা ঘেয়ো কুকুর নিকটে ছিল, সেটাকে একটা লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিলাম। না তাড়াইলে আমাকে ভুগিতে হইবে, আমি ঘুমাইলেই সে শরীর গরম করিবার জন্য আমার পাশে আসিয়া শুইবে। এবার নিশ্চিন্ত মনে রোয়াকে উঠিলাম।

মেঝেটা বরফের মত ঠাণ্ডা। এঃ, বেজায় ভুল করিয়া ফেলিয়াছি! কুকুরটাকে না তাড়াইয়া বরং আদর করিয়া মেঝেটার উপর খানিকক্ষণ শোয়াইয়া রাখিলে মেঝেটা গরম হইয়া উঠিত। গরম করিয়া লইয়া লাথিটা মারিলেই বুদ্ধির কাজ হইত। যাক, ভুল যখন করিয়াছি, তখন অনুশোচনা করিয়া লাভ কি? ভাবিলাম, শুইয়া পড়ি, নিজের দেহের উত্তাপেই মেঝে গরম করিয়া লইব। কিন্তু প্রথমটা যে ছ্যাঁক করিয়া উঠিবে, সেই ভয়েই কিছুক্ষণ বসাইয়া রাখিল। ঘুমে চোখ ঢুলিতেছে, ঠাণ্ডাকে অগ্রাহ্য করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

অল্প সময়ের মধ্যে গভীর নিদ্রা আমাকে ভিন্ন রাজ্যে লইয়া গেল। প্রায় ইন্দ্রপুরী; ঝাড় ও দেওয়ালগিরির আলোতে জলসা-ঘর জমজম করিতেছে। মেঝেতে বিরাট ফরাশ পড়িয়াছে, মাঝে মাঝে তাকিয়া, শ্রোতৃবৃন্দের ভিতর কেহ আরাম করিয়া বসিয়া আছেন, কেহ হামাগুড়ি দিতেছেন, কেহ একেবারে শুইয়া পড়িয়াছেন। বাইজী নৃত্য ও সুরের তালে আবেষ্টনীকে মশগুল করিয়া তুলিয়াছেন। আমি ঠিক নিমন্ত্রিত না হইলেও আসরের একটি কোণে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছি। বাইজীর নৃত্য দেখিতেছি। বাইজীকে দেখিয়া ইহাও মনে আসিয়াছে, কোন দিন যদি টাকা পাই তো বাইজীর মত চেহারা ছুঁইয়া জীবন সার্থক করিব। কি অপরূপ গঠন! প্রৌঢ়ত্ব পার হইয়া গিয়াছে, এখন পর্য্যন্ত একটিও স্ত্রীলোককে স্পর্শ করি নাই, উহাদের দেহস্পর্শে না জানি মানুষ কত সুখ পায়!

স্ত্রীলোককে আমি ভগিনী বা মাতৃরূপে দেখি না। কেন জানি না, নীতিবাদীদের এই সংস্কারকে আমি কখনও বিরাট ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারি নাই। নারী-ভোগের লালসা দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কখনও চরিতার্থ হয় নাই। মানসিক যন্ত্রণা দারুণ হইয়া উঠিয়াছে, সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। বহুকাল পূর্ব্বে একটি অন্ধ যুবতীকে পাইয়াছিলাম। আমারই মত ভবঘুরে, তাহার মালিক তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, সমস্ত দেহ নোংরা ঘায়ে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া। শারীরিক ব্যবধান বজায় রাখিয়া দুই চার দিন তাহাকে সঙ্গে লইয়া ঘুরিয়াছিলাম, কিন্তু আমার রুচি মার্জ্জিত, তাহাকে না ছাড়িয়া দিয়া পারি নাই। হয়তো সে এত দিন মরিয়াছে।

জলসাঘরে আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম, আমার পরিচ্ছদ দেখিয়া পাশের লোকগুলি খাতির করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছিল। আমি মানুষের পাশে দাঁড়াইলেই তাহারা সরিয়া দাঁড়ায়। জলসাঘরে নিমন্ত্রিতদের আচরণে বিস্মিত হই নাই, কারণ এ সম্মান আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া পাইয়া আসিতেছি, আমাকে নিকটে দেখিয়াও কেহ সরিয়া না দাঁড়াইলেই বরং আমার বিস্ময় লাগে।

মাঝে মাঝে বাইজীর খানসামারা গোলাপদানি হইতে গোলাপজল ছিটাইতেছিল, দুই চার

ফোঁটা লক্ষ্যের মানুষ ফসকাইয়া আমার উপরেও পড়িয়াছিল, আরও পড়িলে খুশি হইতাম, কোটের গন্ধটা একটু কেমন-কেমন হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু মার্জ্জিতরুচির তাড়া খাইয়া বলিয়াছিলাম, থাক থাক, যথেষ্ট হয়েছে। আমার কথা শুনিয়া খানসামা হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। আরও কত কি ঘটনা দেখিয়াছিলাম মনে নাই।

হঠাৎ একটি চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গেল। উপরতলার একটি ঘর হইতে একই সঙ্গে তিন চারিটি মেয়ে চীৎকার করিতেছে, খুন করেছে, খুন! মুন্সী, পুলিস ডাক, পুলিস! একেবারে খুন—পুলিস—পুলিস—পুলিস! চীৎকারের সহজ অর্থ উপলব্ধি হইতেই আমি রোয়াক ছাড়িয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িলাম। খুনের ব্যাপারও রাতের বাজারে নিত্য ঘটনা বলিলেই চলে। বিস্মিত হই নাই, কেবল সাক্ষী হইবার ভয়ে রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াছিলাম। রাস্তায় নামিয়াই পিছন দিকে মুখ না ফিরাইয়া সোজা চলিতে লাগিলাম, কারণ চলাই আমার ধর্ম্ম, পেশা এবং জীবিকা-উপার্জ্জনের অবলম্বন।

মড়ার দেশ

সমাধিভূমি, চতুষ্পার্শ্বে বালির চরা ধু-ধু করিতেছে। আবেষ্টনী নিস্তব্ধতা ও কুহেলিকায় নিমজ্জিত। দীর্ঘকাল ধরিয়া এইখানে মানুষ মানুষকে মাটির তলায় অন্তিম শয্যায় শোয়াইয়া আসিতেছে। যে কয়টি কবরের উপর কোন সময় ইটের স্থাপত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই কালের ধ্বংসলীলায় ভূমিসাৎ হইয়াছে। কোন কোনটায় কয়েক স্তর ইট এখনও থাকিলেও লোনায় জরিতেছে। যথাসময়ে স্মৃতির শেষ সম্বলটুকুও নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

মারাত্মক শীতকাল। গোরস্থানের নিকটেই অতিকায় কয়েকটি গাছ—পাতা নাই, কঙ্কালসার ভীতিপ্রদ আকার লইয়া অসাড়ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ণিমার আলো, পাতলা কুয়াশা ভেদ করিয়া কবর ও আশেপাশের বৃক্ষের শুষ্ক ডালগুলিতে আসিয়া পড়িয়াছে। গৃধিনীর বিষ্ঠায় মাঝে মাঝে ডালগুলি সাদা হইয়া গিয়াছে, চিতার অর্দ্ধদগ্ধ শবের অস্থির মত।

থাকিয়া থাকিয়া দূরে পূতি-মাংসভুক হায়েনার কর্কশ স্বর নিস্তব্ধতাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। এমনই একটি স্থানে হায়েনার আগমন-বার্ত্তার সহিত নিকটে নরকণ্ঠস্বর শুনা গেল।

মানুষ কাসিতেছিল, কাশির আওয়াজ শ্লেষ্মাপূর্ণ যক্ষ্মারোগীর মত। মৃতের সহিত মরণোন্মুখের যেন জানাশোনা চলিয়াছে। কাসি থামিতে মাটি খোঁড়ার শব্দ স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

হয়তো কাহার কবরের ব্যবস্থা চলিয়াছে, কিন্তু কাহাকেও তো দেখা যায় না। রাত্রি গভীর হইয়া গিয়াছে, আলো না লইয়া কোন্ গ্রামবাসী এই ভয়াবহ স্থানে আসিবে? যদি কোনও কারণে আলো নিবিয়া গিয়াও থাকে তো একাধিক মানুষকে দেখা যাইবে, কিন্তু কেহ তো নাই! তবে কি নিকটেই হায়েনা মাটি খুঁড়িতেছে, সদ্যপ্রোথিত শবদেহকে বাহির করিয়া আনিবার জন্যই? হঠাৎ আলেয়ার আলো জ্বলিয়া উঠিতে দেখা গেল, মৃৎখননকারী হায়েনা নহে, মানুষ, বিকলাঙ্গ—দুইটি পা-ই হাঁটুর নিকট দোমড়ানো, হামাগুড়ি দিয়া চতুষ্পদের মত চলে। এই কারণে হাত দুইটা পেশী-বহুল হইয়া গিয়াছে, অন্য অঙ্গের সহিত তুলায় সামঞ্জস্যহীন দেখায়। সমাধি-খননকারী মাটি তুলিতে তুলিতে মাঝে মাঝে হিংস্র পশুর মতই চতুষ্পার্শ্বে সন্দিগ্ধভাবে দেখিয়া লইতেছে—নিশ্চিন্ত হইলে পুনরায় দ্রুত মাটি তুলিয়া যাইতেছে।

ইতিমধ্যে বুভুক্ষু-হায়েনার রব দূর হইতে নিকটে আসিতেছিল। মানুষটা কবর-খোঁড়া খোন্তা আরও দ্রুত চালাইয়া দিল। মাটি বালি-মিশ্রিত হওয়ায় গহ্বর অল্পকালের ভিতর গভীর হইয়া গেল! হঠাৎ খোন্তা জোরে নরদেহ আঘাত করিল। পরক্ষণেই মানুষটি হুমড়ী খাইয়া কি পরীক্ষা শুরু করিয়া দিল। যাহা পরীক্ষা করিতেছিল, তাহা দুইটি পা—পা দুইটি নারীর পা। পায়ের উপর যেখানে আঘাত পড়িয়াছিল, সেই স্থানটিতে গভীর ক্ষত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এক বিন্দুও রক্ত নাই, বেদনার অনুভূতি নাই, পা অসাড়। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটিতে রূপার চুটকি রহিয়াছে। মানুষটি সে দুইটা শুধু হাত দিয়া খুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। মাংস ধাতুর মতই শক্ত হইয়া গিয়াছে, বাহির হইবে কেমন করিয়া? কিন্তু খোন্তা ছাড়াও অন্য অস্ত্র ছিল, যাহার দ্বারা চুটকি দুইটি দেহচ্যুত করিতে সময় লাগিল না।

চুটকি ট্যাঁকে গুঁজিয়া পুনরায় নারীর দেহ হইতে মাটি সরাইতে লাগিল। অল্প চেষ্টাতেই সমস্ত দেহ মাটির আবরণ মুক্ত হইয়া গেল। চক্ষু দুইটি গহ্বর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে যে বিভীষিকা দেখিয়াছিল, তাহারই প্রতিবিম্ব মুখের প্রতিটি রেখায় স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সামনের দন্তগুলি বিকশিত, নীচের ঠোঁট বাঁকিয়া এক দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। জীবিতাবস্থায় নারীর নরম ও উষ্ণ বক্ষ, মৃত্যুর পর বরফের মত শীতল এবং পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়া গিয়াছে। মৃৎখননকারী তাহার দেহ নত করিতে কঠিন স্তনদ্বয়ের হিমবৎ স্পর্শে কাঁপিয়া উঠিল, ভয়ে নয়—শীতে।

হায়েনার কর্কশ রব আর শোনা যাইতেছে না, আলেয়ার আলোয় নিশ্চয় সে একলা মানুষটিকে

দেখিয়াছে ; শব্দ বন্ধের কারণ আর কিছুই নয়, শিকারের সান্নিধ্য। বাঁচা মানুষকে উহারা ভয় করিলেও একলা পাইলে ধারালো নখ ও দন্তের দ্বারা ছিঁড়িয়া ফেলে, তাহার পর নরমাংস ভক্ষণ করিয়া নিজেদের অনশন হইতে বাঁচায়।

হায়েনার নির্ব্বাক হইবার কারণ কি, খোঁড়া জানিত। অকস্মাৎ মাটি খোঁড়া বন্ধ করিয়া মুখ নীচু করিয়া বিলাতী বোর-হাউণ্ডের অনুকরণে বহুবার বিকট শব্দ করিল—একাধিক কুকুর একই সঙ্গে আততায়ীকে আক্রমণ করিবার সময় যেরূপ আওয়াজ করে, খোঁড়া তাহারই অনুকরণ করিল। হরবোলার এই অপূর্ব্ব শক্তি আয়ত্ত করিতে কতদিনের সাধনার প্রয়োজন হইয়াছিল অনুমান করা শক্ত। মানুষটা কুকুরের অনুকরণে বিকট চীৎকার করিয়া বোধ হয় কতটা নিজেকে নিরাপদ ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছিল। আজ যে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সে এখানে আসিয়াছে, তাহা শুধু উদরান্নের নয়, অন্য ক্ষুধাও তাহাকে উন্মত্ত করিয়াছে।

সারাটা জীবন অতৃপ্ত লালসা লইয়া সে বাঁচিয়া আছে। জীবন্ত নারীর সহজ সান্নিধ্য সে কখনও ভোগ করে নাই, কারণ তাহার মুখাকৃতি ও দেহগঠন ভয়ঙ্কর ; নাক নাই, কান নাই, গা নোংরা রোগে গলিয়া গিয়াছে। গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষার্থী হইলে ছোট ছেলেরা ভয়ে নিকট হইতে পলাইয়া যায়। বাড়ির কর্ত্তা তাহাকে দেখিলে লাঠি লইয়া তাড়া করে। দোকানীর নিকট দাম দিয়া খাদ্য ক্রয় করিলেও লোকগুলা খাদ্য ঠোঙায় পুরিয়া দূরে রাস্তায় ফেলিয়া দেয়। খাদ্য তাহাকে পশুর মতই কুড়াইয়া খাইতে হয়। খোঁড়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়া যায় শবদেহ সন্ধানে। পুরুষকে তাহার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহারা গহনা পরে না।

গৃহস্থ লগুড়াঘাত করিয়াই তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু রাজপুরুষ তাহাকে দেখিতে পাইলে গারদখানায় না পুরিয়া নিশ্চিন্ত হয় না। প্রহার খোঁড়ার নিকট সহনীয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বন্দী হইয়া বাঁচা তাহার নিকট আতঙ্কের বিষয়। তাই সে নিজেকে দিনের আলো হইতে লুকাইয়া রাখে। মানুষ হইয়াও তাহার মানুষের নিকট থাকিবার অধিকার নাই। বাঁচার সার্থকতা কি, তাহা সে জানে না, তথাপি প্রকৃতির নিয়মে তাহাকে প্রাণ ধারণ করিতে হয়।

অন্নের সন্ধানে মড়ার দেশে সে নিঝুম রাতে ঘুরিয়া বেড়ায়। মৃতার অলঙ্কার অপহরণ তাহার পেশা—কারণ অপহরণকালে শবদেহ বাধা দেয় না, নালিশ করে না। খোঁড়া অপহৃত অলঙ্কার অতি সাবধানে উপযুক্ত ব্যবসায়ীর নিকট সামান্য মূল্যে বেচিয়া দেয়, এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ সামান্য যাহা পায়, তাহারই দ্বারা আহারের ব্যবস্থা করে, এই কারণে তাহাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হয়, সুস্থ মানুষ ও বলিষ্ঠ কুকুরের অশুভ দৃষ্টি এড়াইয়া।

সে খুঁজিতে থাকে কোন স্ত্রীলোক মরিয়াছে কি না, সমাধির অনুষ্ঠান চলিতেছে কি না।

কবর হইতে বহিষ্কৃত রমণীকে আজ প্রাতে সে দেখিয়াছিল। যুবতীর গঠনে একটি মাদকতাপূর্ণ আকর্ষণ ছিল। কামক্ষুধাতুর পঙ্গু লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। জীবিত যুবতীর দেহস্পর্শে কোন্ জাতীয় পুলক সুস্থ পুরুষ ভোগ করিয়া থাকে, খোঁড়ার জানা ছিল না। জানিবার সুযোগও কখনও সে পায় নাই। সেই কারণে নিরালায় স্ত্রীলোকটিকে পাইয়া হঠাৎ আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল এবং চকিতে পৃষ্ঠদেশে কবর খোঁড়ার শাণিত খোন্তাটা গভীরভাবে বিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল।

নিশাবসানে ভোরের আলো সমাধি-ভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রভাতের ক্ষীণ সূর্য্যকিরণে কুয়াশা অপসৃত হইতে দেখা গেল, দীর্ঘকায় বৃক্ষের আঁকাবাঁকা সরীসৃপের মত শিকড়ের নিকটে উন্মুক্ত কবর, আর দুইটি দেহের সম্পূর্ণ কঙ্কাল।

শিল্পী ও শূল

ট্রামটা কলেজ স্কোয়ারের কাছাকাছি আসিতেই হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়া ঘ্যাচ্ করিয়া থামিয়া গেল। একসিডেণ্ট (accident) নয় ত? বাহিরে গোল শুনিলাম "চোর, চোর,—ধর, ধর, ধর।" দৃষ্টি স্বভাবতঃই গোলমালের দিকে আকৃষ্ট হইল, দেখিলাম—একটি খর্ব্বকায় নাদুস ধরণের চেহারা চোখ কাণ বুজিয়া আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। পিছনে দুইটি গ্রাম্য নারী বুক চাপড়াইতেছে এবং প্রসারিত হস্তে পলাতক মানুষটিকে উদ্দেশ করিয়া কি বলিতেছে। নিঃসন্দেহ হইলাম লোকটা গাঁট্‌কাটা। অসহায় অবলাদের মূল্যবান কিছু অপহরণ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বৃত্তের চরিত্র শুদ্ধির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। এমত অবস্থায় প্রচলিত সনাতন প্রথা হইতেছে, চোরকে ধরিতে পারিলেই চাঁদা করিয়া বেধড়ক মার দেওয়া। কাহারও পিছন হইতে অদৃশ্যভাবে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া দুর্ব্বৃত্তের ব্রহ্মতালুতে অন্ততঃ একটি মনোমত চাঁটি কসাইতে পারিলেও সান্ত্বনা থাকিবে যে, চোরকে সজ্ঞানে প্রশ্রয় দিই নাই।

ইস্, লোকটা কি ভাবে ছুটিতেছে দেখ! সহুরে চোর হইয়াও এতবড় বেয়াকুব হয়? যাহা ভাবিয়াছিলাম ঠিক তাহাই ঘটিল, দেখিতে দেখিতে লোকটা একটি বেগবান মোটরের ধাক্কায় ছিটকাইয়া বেকুবের মতই রিক্‌শার তলায় পড়িয়াছে। হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার! একটি হুলুস্থুল

কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। দুঃখিত হইলাম নিঃস্বার্থ চাঁদার অংশটা নষ্ট-চরিত্রের চিত্ত সংশোধনে লাগিল না বলিয়া। কিন্তু গাড়ী চাপা পড়াও কলিকাতায় একটি কৌতূহলোদ্দীপক মজার দৃশ্য। মজা দেখার আশায় আমি ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িলাম। ইতিমধ্যে যথাস্থলে ভীড় দারুণভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। কুতূহলী দর্শকরা পরীক্ষার ফলে নিশ্চিন্ত হইয়াছে, মানুষটা মরে নাই, চোর গোটা দেহেই সজ্ঞানে বাঁচিয়া আছে। আর যায় কোথায়—কে একজন বলিয়া উঠিল,—বেটা চালাক চোর, কিচ্ছু হয় নি, মারো বেটাকে মারো। এইরূপ একটি নেপথ্যে হুকুমের জন্য যেন শান্তিপ্রিয় লোকগুলি অপেক্ষা করিতেছিল। 'মারো বেটাকে' কথাটা সম্পূর্ণ শেষ না হইতেই প্রচলিত সনাতন পন্থার সঙ্কেত সশব্দে সুরু হইল। ধপাধপ কিল চড়ের আওয়াজ ধীরে ধীরে ক্রমবৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। ভীড়ের সহিত লাল পাগ্‌ড়ির উপসর্গ না থাকায় আমি আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেলাম। অগ্রসর কালীন সতর্ক হইতে গিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলাম ইতিমধ্যেই দুইটি দল গড়িয়া উঠিয়াছে।

লক্ষণ সুবিধার নয়,—কথায় বলে "আপনি বাঁচলে বাপের নাম।" নীতিরক্ষার কথা ভুলিয়া কাটিয়া পড়িব কিনা ভাবিতেছিলাম; কারণ এইরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময় অবুঝের দল দুর্বৃত্তকেও সমর্থন করিবার জন্য রুখিয়া দাঁড়ায় এবং পৃথক দল বাঁধিয়া বর্ব্বরের ন্যায় মারপিট করিয়া থাকে। শেষ পর্য্যন্ত কে কোন্ দলভুক্তকে পিটাইতেছে তাহারও ঠিক থাকে না। হাজার হোক বাঙ্গালী ভদ্র-সন্তান বলিয়া আমার একটা জাত্যভিমান আছে; রাস্তার মাঝখানে মার খাইলেও ছোটলোকের মতন তো আমি তাহা ফিরাইয়া দিতে পারি না! কাজেই চলিবার পথে অপর দলের উদ্দেশ্যটা জানিয়া লইলাম। সামান্য অনুসন্ধানেই নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার সন্দেহ অহেতুক: আসলে বেশী ভিড়ের জন্য যাহারা চাঁদা দিতে পারে নাই, তাহারাই স্ত্রীলোক দুইটিকে ঘিরিয়াছে এবং প্রশ্নমালায় বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। শতমুখের প্রশ্ন, কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছে—কত টাকা গেল, কেহ বলিতেছে—যখন নিচ্ছিল তখন চেঁচাতে পারনি কেন? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অবলারা উত্তর যাহাই দিক কেহ তাহা শুনিতেছে না। গোলমালে শুনিবারও উপায় নাই। গোলমাল বা ভীড় কমিবার কথা নয়, কারণ অবলাদের ভিতর একজন যুবতী; তাহার আবার গ্রাম্যসুলভ শ্লথ বেশ; গঠনে oriental কলাবিৎ-সম্মত তোবড়ান হাড্ডির decoration না থাকিলেও যৌবনলব্ধ মাংসের অভাব নাই—সংক্ষেপে চেহারাটা দোহারা। যাহারা ঘটনাস্থলে chivalryর সুবিধার জন্য ওৎ পাতিয়াছিল, তাহারা আটপৌরের আঁটসাঁট দোহারা গঠনেই সন্তুষ্ট। বলিতেছিলাম মজা দেখার কথা, অবান্তর শরীর-গঠন আসিয়া পড়িল।

কলিকাতা সহরে মজার যেমন অভাব নাই, তেমনি তাহার সহিত বিপদও যেন লাগিয়াই

থাকে। রাস্তার মাঝে মজার ব্যাপার মানেই ভীড়। পাশহীন (Pass) ভীড় আবার আইনতঃ দণ্ডনীয়, সুতরাং পাহারা-ওয়ালার আবির্ভাব হইতে দেরী লাগিল না। ভিড়ের মাঝে নীতিরক্ষকরা রাজপুরুষের আগমন-খবর কেমন করিয়া রাখিল কে জানে! দেখি ক্ষণিকের ভিতর যে যতটা সম্ভব চাঁদার অংশ দিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

আমিও "মহজনগত পন্থা" অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, এমন সময় পিছন হইতে একজন জোয়ান পাহারাওয়ালা থপ্ করিয়া আমার কব্জিটা চাপিয়া ধরিল। নিরবচ্ছিন্ন পাশবিক শক্তির প্রকাশ। বলিষ্ঠ পুরুষের দৃঢ় চাপে সমস্ত হাতটাই অসাড় হইয়া আসিতেছিল। রক্তচলাচল বন্ধ হইবার উপক্রম দেখিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলাম, 'বাবা, আমি তো কিছু করি নাই।"

এইরূপ কাতরোক্তি শোনা পাহারাওয়ালাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। সে কর্ণপাত না করিয়া ঊর্দ্ধমুখ উঠ্‌তি গুম্ফে একটু চাড়া দিয়া দিল। ভাবখানা—ওসব চালাকি আমরা বুঝি। সারাটা জীবন মাদুলী পরিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছি। ধস্তাধস্তি করিতে সাহস হইল না, প্রথম কব্জি জখম হইতে পারে, তাহার উপর মাদুলী ছিঁড়িলেই তো চমৎকার, শেষ পর্য্যন্ত পৈতৃক প্রাণটা লইয়াই টানাহেঁচ্‌ড়ান পড়িয়া যাইবে। গত্যন্তর না থাকায় মনে মনে বলিলাম,—পরের জিনিস পেয়েছ যা খুসী কর বাবা!

পরের ঘটনা থানায়।

ধরপাকড়ের ভিতর চোরের সহিত সাক্ষী হিসাবে যাহারা থানায় আসিয়াছিল তাহাদের ভিতর আমিই একমাত্র ভদ্রলোক অর্থাৎ অপর কেহ দেহাচ্ছাদন করে নাই। ভাবিয়াছিলাম, এই কারণে একটু স্বাতন্ত্র্যের ব্যবস্থা হইবে, কিন্তু তাহা হয় নাই। ঝাড়া দুই ঘণ্টা কাল আমাকেও দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল। বুঝিলাম, চুরি সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে থানায় আসিলে সব একাকার হইয়া যায়। এখানে জাত্যভিমানের স্থান নাই।

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব তখন থানায় অনুপস্থিত; কোন কেস্ তদন্তে বাহির হইয়াছেন। ইতিমধ্যে কবুলের কাজটা যথেষ্ট অগ্রসর করিয়া রাখিবার নিমিত্ত জমাদার সাহেব চোরকে ঠাসিয়া ধরিয়াছে। হিন্দুস্থানী ও বাংলার সংমিশ্রণে যতই ধমক দিয়া অবোধ্য ভাষায় প্রশ্ন করিতে থাকে, কি চুরি করেছিস্, কোথায় করেছিস, কখন করলি, ততই চোরটা কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর দেয়,—দোহাই বাবা, আর ছবি আঁকব না; তোমার পা ছুঁয়ে হলফ্ খাচ্ছি, আমি চুরি করিনি, কেবল ছবি আঁকি, পট লিখি, তারি লেগে এই বিপদ। আরে উ মাগীর আবার আমি কি লিব? উ যে আমার বিয়ে করা বৌ গো!

চোরের উক্তি শুনিয়া আমারই পিত্তদাহ সুরু হইয়াছিল। বেটা একেবারে হারামজাদা

ঘাগি চোর, পাগল সাজিবার চেষ্টায় আছে। বলার আবার কি কায়দা, চোখে জল! হিন্দু সমাজের সুস্থ পরস্ত্রীকে বলে কিনা, আমার বিয়ে করা বৌ! নারীর সতীত্বের উপর যাচ্ছেতাই ইঙ্গিত! শিক্ষিত হিন্দু হইয়া আর কত সহ্য করিব! মনে হইল বেটা সমস্ত জাতটাকে কলুষিত করিবার চেষ্টায় আছে। উত্তেজনা সংযত করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "মারো জমাদার সাহেব, মারো, বেটা পাগল সাজিবার চেষ্টায় আছে। আহা, চাঁদ আমার চুরি করেন নি, ছবি আঁকেন! গলে গেলাম আর কি!"

ছবি যখন আঁকে তখনই তো বেটা অতি পাকা চোর। ছবি আঁকা আর চুরি করায় কোনই তফাৎ নেই।

লোকটা কবুল খাইলেই আমরা ছাড়ান পাই; সেই কারনেই জমাদার সাহেবের দিকটা জোর দিয়া সমর্থন করিতে চাহিয়াছিলাম। ফল হইল বিপরীত, জমাদার আমাকে চোরের সহকর্ম্মী সন্দেহ করিয়া, আসল চোরকে ছাড়িয়া, আমার দিকে ফিরিলেন। সে কি চাহনি! চোখ দুইটা যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বলিতে সুরু করিল। লোকে বলে শিকার দেখিলে বাঘের চোখ জ্বলে—তবে কি বাঘ জমাদার অপেক্ষা ভয়ঙ্কর জীব! জমাদার ধীরে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। সাপ ভেকের দিকে চলিলে ক্ষুদ্রকায় চতুষ্পদীয়টি যে ভাবে সম্মোহিত হইয়া থাকে আমার অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ ঘটিল। কি বলিয়াছিলাম ও কি বলিতে চাহিয়াছিলাম, সব তাল গোল পাকাইয়া গেল। জমাদার নিকটে আসিয়া অতি নরম ভাষায় বলিল—ওকে যখন চোর বলে জান, তখন চুরির ঘটনাটি বলে ফেল বাছাধন।

তাওত বটে! লোকটা যে চোর তা শপথ করিয়া বলাতো সম্ভব নয়। হলফ্ খাইলেই আমার উক্তিকে প্রমাণ সহ খাড়া করিতে হইবে। লোকটাকে সকলে প্রহার দিয়াছে তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ ভাবিয়া আমিও চোর বলিয়াছি। চোর ভাবিলেই তাহা বামাল সহ প্রমাণ করিতে হইবে, এমন যুক্তি তো কখন মনে আসে নাই। আমার আচরণে জমাদারের গলা হঠাৎ গুরু গম্ভীর হইয়া উঠিল। মুষ্টি নিষ্পেষিত হইতে হইতে সশব্দে টেবিলের উপর গুড়ুম্ করিয়া পড়িল। ছোকরা কনেষ্টবলের হাতের চাপুনিতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসিয়াছিল, তাহার উপর ঐ বাঘের থাবার মত দৃঢ় মুষ্টির আশু ব্যবহারের স্চনায় বুঝিলাম, মাদুলী আর কাজে আসিতেছে না। অপঘাৎ মৃত্যু সুনিশ্চিত। চোখ কাণ বুজিয়া মুহূর্ত্ত গুণিতে লাগিলাম, এমন সময় মাদুলীর অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় পাইলাম। জমাদারের বুটজুতা যুক্ত পা দুইটি খটাং খট্ করিয়া জোড়া লাগিয়া গেল, তাহার পরই নিশ্চল।

ইহা মিলিটারি নমস্কার, পায়ে হাতে সম্মান প্রদর্শন। পা নিশ্চল হইলেও হাত যে সচল

হইবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি আছে! আস্তে আস্তে চোখ খুলিয়া দেখি ইন্‌স্পেক্টর সাহেব আসিয়াছেন। আঃ বাঁচা গেল! একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসিল।

ত্রাণ কর্ত্তার দিকে ব্যাকুল ভাবে তাকাইলাম। তিনি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন জমাদারকে অনুসরণ করিবার সঙ্কেত দিয়া, হয়তো মন্ত্রণার প্রয়োজন ছিল। মাদুলীটা একবার কপালে ঠেকাইয়া লইলাম। 'Slaves of Gods'—কত বড় মিথ্যা অপবাদ তাহা আমার জাগ্রত দেবতার মাদুলীই প্রমাণ। মনে কেমন একটা বল পাইলাম, বোধ হয় এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইব।

কিছুক্ষণ পরে উভয়েই ফিরিয়া আসিলেন। ঘরে প্রবেশ কালীন ইন্‌স্পেক্টার সাহেব ভ্রূকুটি-পূর্ণ চাহনির দ্বারা আমার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া একটি ইঙ্গিত করিলেন, মনে হইল কোণার বেঞ্চিতে বসিবার আদেশ। ভদ্রসন্তানকে অভ্যর্থনার পরিবর্ত্তে কেহ আদেশ করিয়া বসিতে বলে কখন শুনি নাই। যদ্দেশে যদাচার, আদেশ মিশ্রিত শিষ্টাচারে একটু সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল, ভাবিলাম জমাদার ও কনেষ্টবলটার অভদ্র আচরণ সম্বন্ধে নালিশ করিয়া দি; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলাম জোয়ান শেয়ানাদের না-ঘাঁটানই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইবে। মন্দের ভাল, আমাকে একেবারে বাজে লোকের সমান ভাবেন নাই—ইহাই যথেষ্ট। আত্ম-সম্মানবোধটা টিকিয়া গেল ভাবিয়া বসিতে যাইব, অমনি ইন্‌স্পেক্টার সাহেবকে অগ্রাহ্য করিয়া জমাদার হুকুম দিল, "খাড়া রহো বেকুফ!"

গুরু নিনাদে চমকাইয়া গেলাম, সত্যই তখনকার মত বেকুব বলিয়া খাড়াই রহিয়া গেলাম। ইহার পর আমাদের লইয়া থানায় যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। সংক্ষেপে এইটুকু বলিতে পারি—যুবতী স্ত্রীলোকটাই আমাদের বাঁচাইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত চোরকেই স্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিল!

চোর স্বামী সাজিয়া হাজত হইতে নিষ্কৃতি দিলে কি হইবে?—কাহিনীর বাকিটা এখনও বলা হয় নাই; সেই কারণে পূর্ব্ব ঘটনার বিবৃতি দিতেছি:

আসলে পটুয়া পুরুষানুক্রমে পল্লীবাসী, দূর গ্রামের আদি বাসিন্দা। নিরীহ প্রকৃতির মানুষ, খায় দায় ঘুমায়। অবস্থা এক রকম সচ্ছল বলা চলে। উপরি পাওনার আশু সম্ভাবনা থাকিলে অর্থ প্রাপ্তির পূর্ব্বেই প্রকাশ্যে নেশাটা-আসটা করিয়া থাকে। পেশা তাহার পটাঙ্কন। পূজা-পার্ব্বণ আসিলে জাতব্যবসাটা কাজে লাগায়, উপরি কিছু পাওনা হয়। প্রচুর আহার ও তদুপযুক্ত দিবানিদ্রার আসক্তিটা একটু উৎকট রকমের, অর্থাৎ উক্ত বিলাসের কোনরূপ বিঘ্নের সম্ভাবনা থাকিলে অর্দ্ধেক রাজত্ব ও একটি গোটা রাজকন্যাকেও প্রত্যাখ্যান করিতে তাহার বাধে না। মোট

কথা অতিবড় প্রলোভন দেখাইয়াও তাহাকে পৈতৃক ভিটা হইতে নড়ান অসাধ্য কর্ম্ম। এমন একটি জীবকেও হিড়িকে পড়িয়া সপরিবারে সহরে আসিতে হইয়াছিল এবং সহরে আসিয়া প্রাপ্যের অধিক সম্মান বদহজম হওয়ায় তাহার কি অবস্থা হইয়াছিল প্রথমেই বলিয়াছি। এইবার যে ঘটনাকে সূত্র করিয়া বেচারা নাজেহাল হইয়াছিল তাহারই গোড়ার কথা বলি।

ব্যাপারটা এইরূপ—জাতীয় শিক্ষার দৈন্য হইতে দেশবাসীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত গ্রামে অবতারের আবির্ভাব হইয়াছিল।

আর্টকে জনসাধারণের নিকট পৌঁছাইবার ধুয়া অনেক দিন ধরিয়াই চলিয়াছে। যাবতীয় আর্টের শিক্ষাজীবী ও বহুবিধ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিও এই ব্যাপক প্রচারে সমর্থ না হওয়ায় জনসেবী মহাপণ্ডিত ও রসিক-চূড়ামণি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থে চতুষ্কলা হিতৈষিণী সভার প্রধান প্রচারক হইয়া স্বয়ং গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলাচর্চ্চায় ব্যক্তিগত মত যুক্তি-সম্মত হইলেও সমর্থন তাঁহার নিকট অর্থহীন। আর্টে প্রাচীন tradition, অথবা ধর্ম্মসংক্রান্ত সাত্ত্বিক রসই তাঁহার উপাস্য। ইহা হৃদয়ের কথা, সুতরাং যুক্তির ফাঁক নাই। কলা চর্চ্চায় উচ্চ, মধ্যম, ও সহজিয়া গোঁজামিল-বাদীদের আদর্শকে মন্থন করিয়া তিনি জনোপযোগী রসসৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং পাত্রের উপযুক্ততাঅনুসারে দীক্ষা দান করেন। উদ্দেশ্য সাধু, ইহাতে গোঁজামিল শিল্পীদের সুবিধা বাড়ে এবং দীক্ষার দিক দিয়া ব্যক্তিগতভাবে রসগ্রহণ-শক্তিও সহজ হইয়া যায়; আর্ট নির্ব্বিচারে ধর্ম্মের ন্যায় 'ম্যাস্'এর নিকট ছড়াইয়া পড়ে।

সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাবে সুপ্ত গ্রাম জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার নিমিত্ত গ্রামের জমিদার, হাইস্কুলের হেড্মাষ্টার, এমন কি কলেক্টর সাহেবের সেরেস্তাদার পর্য্যন্ত সাঙ্গোপাঙ্গসহ প্রস্তুত হইয়াছেন। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষরাও জনহিতকর কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। বোর্ড আফিসের প্রাঙ্গণে সামিয়ানা খাটান হইতেছে। জনরব ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব নিজেও নাকি অভিনন্দনে যোগ দিবেন।

রাস্তার ধারে সামিয়ানার নিকটেই রামু মুদির দোকান। সে একটি ঝানু ব্যবসাদার। ইহারই ফাঁকে কৃষ্টিসাধনের যাবতীয় উপকরণগুলির গোটা তালিকা সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছে। যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতাসহ কতকগুলি পুরাতন ব্যবহার করা ঝলসান হাঁড়িতে আল্পনা দিয়া দোকানের সামনে সাজাইয়াছে। কাজ-করা পচা কাঁথাটাকে সহজে আকৃষ্ট হইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। কোথা হইতে একটা বাউলকেও ডাকিয়া আনিয়াছে। বাউল অনবরত নশ্বর দেহ ও অজানা ভগবানের কথা গ্রাম্য সুরে গাহিয়া চলিয়াছে কিন্তু তাহা শুনিবার মত ভক্ত এখনও জমে নাই। দোকানের সামনে গোময়লিপ্ত উঠানে বসিয়া যোদো গোয়ালা তাহার চিহ্নিত কড়িবাঁধা হুঁকায় সবে দুইটান

দিয়াছে, এমন সময় দেখে ওপাড়ার পদীপিসী মাথায় সজির ঝুড়ির টাল সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতে দ্রুত চলিয়াছে এবং মাঝে মাঝে সামনে মুখ রাখিয়াই বলিতেছে "ওলো শিগ্‌গির আয় লো, শিগ্‌গির পা চালিয়ে চল্‌!"

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কোন একটি ভীতির আশঙ্কা জানান হইতেছিল সে পদীপিসীর পোষা মেয়ে। দুই দুইবার বিবাহ দিয়াও মেয়ে সায়েস্তা হয় নাই। জামাইরা তেজীয়ান বৌ সামলাইতে না পারিয়া মেয়ে ফেরৎ দিয়া গিয়াছে। মেয়ের নাম পট্‌লি। পট্‌লি ওগ্রামের নাম করা মেয়ে, ভয় ডর তার কিছু নাই। কেষ্টার সে তোয়াক্কা রাখে না। সে রসিকতা করিতে জানে এবং রসের কথা শুনিবারও লোক আছে। তাছাড়া গাজনের সময় সে একাই একশ, তাহার নাচ দেখিতে দূর গ্রাম হইতে লোক আসে। উঠ্‌তি বয়সে বেরসিকের দল তাহাকে ভ্রষ্টা বলিয়া কাণা-ঘুষা করিয়াছিল। এখন কাণাঘুষার কারণ সর্ব্বজ্ঞাত হওয়ায় পট্‌লিকে লইয়া আর কেহ দুষ্ট কথা বলে না, বরং সুবিধা পাইলে তাহার খোদাইকরা সুঠাম গঠনটির উপর চোখ বুলাইয়া লয়; দুই একটি প্রেমের কথার আদান প্রদানও হইয়া থাকে।

এমন একটি প্রাণীও আত্মরক্ষার আশায় পদীপিসীর অনুসরণ করিতেছে দেখিয়া যদো গোয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, "ও পদীপিসী অমন হন্তদন্ত হয়ে চলেছ কোথায়? তোমার সঙ্গে পট্‌লিও ছুটেছে, আমিও পেছু নেব নাকি?"

উত্তরে পট্‌লি সম্মার্জ্জনীর সহিত যদুর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া এমন একটি রসিকতা করিল যে যদু আর ভাবাবেগ সামলাইতে পারিল না। একে যৌবনোন্মত্তার গঠনের দোলা তাহার উপর ঝাঁটার শতমুখী আপ্যায়নে—যদোর পুরাতন স্মৃতিগুলি সজাগ হইয়া উঠিল। সে মৌজের তামাক ছাড়িয়া সত্যই পট্‌লির অনুসরণ করিল। এরূপ ঘটিবে পট্‌লি জানিত।

যদু নিকটে আসিতেই নথটা নাড়া দিয়া বলিল—"মরদ তো ভারি, ওদিকে দেখ গিয়ে গ্রামে মেয়ে-ধরা এসেছে।"

যদো—আরে থেমেই কথাটা বলে যা না, তোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার শক্তি কি আর আমার আছে!

পট্‌লি—নেই বলেই তো বল্লুম, ভারি তো মরদ্‌।

যদো-গয়লা শেষ পর্য্যন্ত পিছাইয়া পড়িল।

ফিরিয়া আসিয়া রামু মুদীকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি বল তো হে? সারা গাঁয়ের খবরাখবর তো তোমার কাছে। শেষ পর্য্যন্ত পট্‌লিটারও ভয় ডর লেগেছে দেখছি।

রামু মুদী—যজ্ঞিকাণ্ড তো ওদেরকে নিয়েই। সহরে পর্য্যন্ত ওর নাচের খবর পৌছেছে।

ওর নাচ আর ও পাড়ার পটুয়ার ছবি নিয়ে কলকাতায় হুলুস্থুল কাণ্ড চলেছে। সেখানে পটুয়ার ছবি ঝোলাবার জন্যে পাকা দালান তোলা হচ্ছে। পদীপিসীকে আজ সকালেই ফুসলে এলুম—'ঐ ভ্রষ্টা মেয়েটাকে ছেড়ে দাওনা বাপু, তুমিও মোটা টাকা পাও, আমারও কিছু লাভ হয়।'

যদো,—রাজি নয় নাকি? ভয়টা কিসের?

রামু—ওকে নাকি গোরা সাহেবদের সামনেও নাচতে হবে।

যদো—গোরার সামনে পটুলি নাচবে? বাইজিদের হল কি? মেমসাহেবরাও তো শুনেছি জোর নাচে, তারাও কি....

কথাটা শেষ হইল না, রামুর দোকানের সামনে স্ত্রী-পুরুষে দল বাঁধিয়া অতি আধুনিক সহুরে মানুষ আসিয়াছে।

সাড়ীর সেকি গোলক ধাঁধাঁই প্যাঁচ! এদিক ঘুরিয়া দেহটাকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত উর্দ্ধাঙ্গ ঢাকিবার যথেষ্ট কাপড় থাকে নাই। ইহা ফ্যাশান সঙ্গত আবরু; সুতরাং সন্দিগ্ধ হইবার কিছু নাই। খাস সাহেবি কথাবার্ত্তা চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে পাড়ার ছোট বড় দিগম্বর ছেলেরা আধুনিকদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। দুর পল্লীগ্রামে এইরূপ মজার দৃশ্য দুর্লভ।

ব্যবসায়-বুদ্ধি রামুর সাংঘাতিক ভাবে প্রখর। ক্রেতাদের সান্নিধ্য সম্ভবপর হইতেই বাউলটাকে গলা বাড়াইয়া গাহিতে বলিয়া দিল। এমনিতেই সে নীচু গলায় গায় না, তাহার উপর আওয়াজ চড়াইতে সুর চীৎকারে পরিণত হইল। অকস্মাৎ তারস্বরে চীৎকার সত্যই আকর্ষণের হেতু হইয়া উঠিল। ইন্‌ডাষ্ট্রির সহিত আর্টের এই অপূর্ব্ব সম্মিলনে কুতূহলী সহুরে দর্শকবৃন্দ প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। প্রশংসা করিলেই কিছু কিনিতে হয়। আল্‌পনা-কাটা জোড়া হাঁড়িটার দাম উঠিল ১০৲ টাকা। ছেঁড়া কাঁথাটার সে কি তারিফ! অল্প সময়ের ভিতর রামুর দোকান প্রায় লুট হইয়া গেল। মুড়ি, মুড়্‌কি, খৈ হইতে আরম্ভ করিয়া ঝুম্‌কা লাগান সিক্কা, বিছানা পরিষ্কার করা উলুঘাসের বাহারি ঝাঁটা, এমন কি পিতলের তৈলাক্ত নোংরা পিলসুজটা পর্য্যন্ত বাদ পড়িল না। সবই 'কিউরিও'র অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাহক স্কন্ধে ক্রেতাদের অনুসরণ করিল।

মুদীর দোকানে যখন আর্টের পৃষ্ঠপোষকতা চলিতেছিল, ঠিক সেই সময় পটুয়ার আটচালায় শুদ্ধির ব্যবস্থা সুরু হইয়াছে, হরিজন উদ্ধারের আয়োজন, মহাযজ্ঞের পূর্ব্বাভাষ। ফল, ফুল, চন্দন ও ধুনার গন্ধে আবেষ্টনী সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পট্ট বস্ত্র পরিয়া আল্পনা-চিত্রিত পীঠিকায় পটুয়া আসীন; অনতিদুরে,—সাম্‌নে পিছনে, বামে দক্ষিণে,—ক্যামেরা হস্তে ওস্তাদ ফটোগ্রাফাররা প্রস্তুত হইয়া আছে। সকলেই বিখ্যাত মাসিক ও দৈনিক পত্রিকার প্রতিনিধি; পটুয়ার ঘরোয়া আবেষ্টনীর নিভু্ল বিবরণ দিবার তাগিদে সকলেই তটস্থ। পুষ্প ও চন্দন অর্ঘ্যের নাগালেই পটুয়ার

সৃষ্টি ও সৃষ্টির আধার সারি করিয়া সাজান হইয়াছে। পেল্লাদি পুতুল ও তাহার ছাঁচ অর্থাৎ ট্র্যাডিশনাল্ আর্টের আধার, দেবদেবীর মূর্ত্তির খড়ের কাঠাম। এল্‌বার্ট ফ্যাশানের জুতা পরিহিত অসমাপ্ত কতিপয় মাটির কার্ত্তিকের, তাহারই পদতলে এক বাণ্ডিল গুটান কাগজ। সে গুলি রেখাচিত্রের সর্‌টিফায়েড্ কপি;—বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হইতে হইতে বর্ত্তমানে পটুয়ার মালিকানার নথি হিসাবে রাখা হইয়াছে। তড়িৎবেগে স্বদেশী পটচিত্র শেষ করিতে হইলে এই নথী একমাত্র সহায়ক। পরের দেয়ালে বিনি পয়সায় বিজ্ঞাপন পাকা করিবার নিমিত্ত যে ভাবে সহর ও সহরতলীতে ষ্টেন্‌সিলিং করা হইয়া থাকে ইহা তাহারই আদি চাল। নথী বা ছবির রেখাগুলি বিন্দুবৎ ছিদ্র দ্বারা ভরাট করা হইয়াছে উল্টাইয়া গুঁড়া কয়লার পুঁটুলি কায়মনে আচ্ছা করিয়া ঠুকিতে পারিলেই জাত ট্র্যাডিশনাল্ পটচিত্রের কাঠাম বাহির হইয়া আসে। পেল্লাদি পুতুলের ছাঁচকে প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে ট্র্যাডিশনাল্ রস-সৃষ্টির যন্ত্র কি ভাবে নিরবচ্ছিন্ন হাতের সাহায্যে চালিত হইয়া থাকে তাহা জনসাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বলিয়া।

সবই প্রস্তুত; কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। বরণমাল্য লইয়া অবতার শুদ্ধির প্রধান পুরোহিত হিসাবে উঠিলেন। পিছনে অনুগৃহীত কাঁচায়পাকা শিল্পী ও সাহিত্যিকরাও উঠিলেন। অনুগৃহীত বলিলাম, কারণ তাঁহার কৃপায় গোঁজামিলবাদীরা শিল্পী নামে খ্যাত হইয়াছেন, তদুপরি সাহিত্যিকের আসরেও বসিবার ছাড় পত্র পাইয়াছেন। অনুগৃহীতদের ভিতর যাঁহারা উদীয়মান সাহিত্যিক, তাঁহারা জীবিত শিল্পীকে নিজের সমাজে গ্রহণ করিয়া এবং দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আত্মতুষ্টি লাভ করিয়াছেন। লিখন পঠন শক্তি থাকা সত্বেও সাহিত্যিকরা নিজেদের ঔদার্য্য, প্রকাশ্যে সমর্থন করিবার জন্যই সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া আসিয়াছেন। অবতারের ইচ্ছাই তাঁহাদের নিকট বেদবাক্যের ন্যায় ধার্য্য হইয়াছে। সাত সমুদ্র তেরনদীর পাঁর হইতে পাশ্চাত্য "স্টুডিও" পত্রিকার সম্পাদক খাস্ ইংরাজী ভাষায় পটুয়াকে অভিনন্দন জানাইয়াছে। তাহারই তর্জ্জমা অবতার পাঠ করিতে উদ্যত। মুখ ব্যাদান করিতেই ফটোগ্রাফাররা ফ্ল্যাশ্‌লাইট্ এর সুইচ্ টিপিতে আরম্ভ করিয়া দিল। বিনা মেঘে বজ্রালোক! শব্দ নাই তথাপি ক্ষণে ক্ষণে বজ্র পতনের আশঙ্কা বিদ্যুৎ আলোকে প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

পটুয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। নিরীহ প্রকৃতির গ্রাম্য জীব বিরাট সম্মানের অনিবার্য্য প্রকরণ গুলিকেও দুর্যোগ ভাবিতে শুরু করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অবতার থাকিয়া থাকিয়া গদগদভাবে অভয় দান করিতেছেন।

শুদ্ধি ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। পটুয়া জন্ম সার্থক করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইয়া সপরিবারে সহরে আসিয়াছে। হাওড়ার আকাশস্পর্শী পোল, মায়াপুরীর ন্যায় রহস্যময় অট্টালিকা শ্রেণী ও

জনতার অসম্ভব সমাবেশ, দেখিতে দেখিতে তাহার মনে খট্‌কা লাগিয়া গিয়াছে: এমন একটি স্থানে ত্রিরাত্রি কাটাইলে তাহার স্কন্ধে কিছু ভর করিয়া বসিবে না তো? সংক্ষেপে তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছে না; মন এমনই বিগড়াইয়াছে যে, ত্রিরাত্রি কাটিবার পূর্ব্বেই হয়ত সে আত্মঘাতী হইতে পারে।

যখন সে এইভাবে সঙ্কটাপন্ন, সেই সময়েই ঘটা করিয়া কলেজ স্কোয়ারের নিকট কোন বিখ্যাত বিদ্যাপীঠের প্রশস্ত ঘরে তাহার সম্বর্দ্ধনা চলিতেছিল। অবতার যতই দৃঢ় ভাষায় প্রমাণ করিতে চান দেশের লোক অন্ধ, অবুঝ ও বেরসিক, যতই বলিতে চান দীনকে নত করিবার অধিকার কাহারও নাই, ততই পিছনের সীটে কলেজী ছোকরা মহলে তর্কের জটলা বাড়িতে থাকে। আসল গণ্ডগোলের সূচনা, সিদ্ধ-পুরুষের কথাকে বেদবাক্য না মানিয়া তাজা ছোকরার দল, যুক্তির সামঞ্জস্য আনিবার চেষ্টা চালাইয়াছে। অপর দিকে ধৈর্য্যের পরীক্ষায় পটুয়ার অবস্থা 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!' অভ্যর্থনায় হস্তমর্দ্দন দারুণ ভাবে চলিয়াছে। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী রিসেপ্‌শন্ হল্-এ যে ভাবে নিমন্ত্রিতদের সহিত হাতের ছোঁয়া লাগাইয়া আল্‌গোছে আলাপ শেষ করিয়া থাকেন, সেইভাবে উচ্চমঞ্চে দাঁড়াইয়া অবতার-অনুগৃহীতদের আদেশ ও শিক্ষার ফলে পটুয়া করমর্দ্দন করিতে করিতে ঘর্ম্মাক্ত ও কম্পিত দেহে অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

এই সময় একটি কাণ্ড ঘটিয়া গেল। 'কারণে'র অনুপ্রেরণায় বিলাত ফেরত কোন ঘোরতর মার্জ্জিত বাঙ্গালী-সাহেব রসানুভূতির আবেগে "কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্" বলিয়া পটুয়ার পরে পটুয়া গৃহিণীরও হাত দেশী প্রথাতেই দুই হস্তে চাপিয়া ধরিল। পটুয়া-গিন্নী এতটা বাড়াবাড়ির জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে হাঁউমাউ করিয়া উঠিতেই পটুয়া ভড়্‌কাইয়া একেবারে বেগে রাস্তার দিকে ছুট। পিছন হইতে রব উঠিয়াছিল "ধর, ধর, ধর, চাপা পড়বে।" কথাটা কোলাহলে ওলট্‌ পালট্‌ খাইয়া বিকৃত ভাবে দাঁড়াইয়াছিল "ধর, ধর, চোর!"

শিল্পীর কথা বলা হইয়াছে। উহার সহিত শূলের যোগাযোগ কি ভাবে ঘটিয়াছিল তাহা পাঠকেরাই বিচার করিবেন।

মালকোণ্ডা পেণ্টার জঙ্গল, করনুল

শিকার-কাহিনী—(সত্য ঘটনা)

১৯৪৪ সালের ৮ই মে কিছুকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১০৩ ডিগ্রী জ্বর লইয়া ট্রেনে উঠিয়াছিলাম। গম্যস্থল পাঁচ শত মাইল দূরে, গভীর অরণ্যে। ভয়াল আবেষ্টনীর আকর্ষণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারি নাই। জীবহিংসার আদিম প্রবৃত্তির চরিতার্থতার নিমিত্ত অরণ্য আমাকে টানিতেছিল। প্রথম, স্ত্রীর নিকট হইতে বাধা আসিয়াছিল কিন্তু আমার দারুণ উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া শেষ পর্য্যন্ত জ্বর লইয়াই যাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন বাধা দিলে জ্বর অপেক্ষা অধিকতর অবাঞ্ছনীয় কিছু ঘটিয়া যাইবে।

আরজি মঞ্জুর হওয়াতে মাঝপথ হইতে দুই বার তারে স্বাস্থ্যের খবর জানাইব বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সঙ্গে পিয়ন ছিল, ষ্টেশনে পৌছিয়া তাহাকে সুস্থতার সংবাদসহ দুইটি পৃথক টেলিগ্রাম দিয়া দিলাম—আদেশ ছিল যথাস্থান হইতে কাজটা সারিয়া ফেলিবে, আমি কি রকম থাকি তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই।

গাড়ীতে উঠিয়া দেখি দুইটি গোরা এক দিককার গদি দখল করিয়া বসিয়াছে—কাঁধের উপর ধাতুনির্ম্মিত অনেকগুলি তারকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন। অনুমান করিলাম সামরিক বিভাগের কোন হোমরা-চোমরা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হইবে। গোরার অবাঞ্ছনীয় সান্নিধ্যের সম্ভাবনা হইলেই আমি সময় থাকিতে আস্তিন গুটাইয়া প্রস্তুত হইতাম, ইহা আমার বাল্যকালের স্বভাব; পূর্ব্বাভ্যাস ছাড়িতে পারি নাই, আস্তিন গুটাইবার চেষ্টা করিলাম—বাহু উপযুক্তভাবে নড়িল না, গাঁটে গাঁটে বেদনা—প্রতি অঙ্গের জোড়গুলি অচল হইয়া গিয়াছে।

গাড়ীতে আমার দিকটায় বিছানা পাতা ছিল—যাঁহারা ষ্টেশন পর্য্যন্ত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া সটান বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। অল্পক্ষণ পরেই বম্বে মেল ছাড়িয়া দিল। জ্বরও রেলচক্রের দ্রুত গতির সহিত পাল্লা দিয়া বাড়িতে লাগিল। প্রায় বেহুঁসের মত হইয়া আসিতেছিলাম। যাহাদের দেখিয়া কিছু পূর্ব্বে ভিন্ন উদ্দেশ্যে বাহু নাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহাদেরই দিকে কোন প্রকারে হস্ত প্রসারিত করিয়া জল ভিক্ষা চাহিলাম। তখন আমার উঠিবার ক্ষমতা নাই।

সাহেব আমাকে উঠাইয়া সামরিক জলের পাত্র হইতে জল খাওয়াইলেন। তাহার পর

নিজের রুমাল লইয়া আমার কপালে জলপট্টি দিয়া দিলেন। অপরিচিত পরদেশীর কৃপায় অনেকটা আরাম বোধ করিলাম, ধীরে ঘুম আসিতে লাগিল। পরের দিন বেশ বেলায় ঘুম ভাঙ্গিল। গাড়ীতে আমি ছাড়া আর কেহ নাই। কপালে বিদেশী দরদীর রুমাল শুকাইয়া গিয়াছে। বন্ধুকে হয়ত জীবনে আর দেখিতে পাইব না, দেখিলেও চিনিতে পারিব না—কিন্তু তাহার জলপট্টির শীতল অনুভূতি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

পণ্টুফাল জংসন হইতে ট্রেন বদল করিয়া পাহাড়ী পথের যাত্রী হইলাম। গোড়ার দিকটা উপত্যকার মত ধূ ধূ করিতেছে, দিগন্তব্যাপী অনুর্ব্বর শুষ্ক মাঠ, মাঝে মাঝে দেখা যায় চটা-ফাটা অতিকায় প্রাচীন পাথর অজানা অতীতের নিশ্চল প্রহরী, জীর্ণ অস্তিত্ব লইয়া প্রখর রৌদ্রে যুগ যুগান্তর ধরিয়া পুড়িতেছে। বেশীক্ষণ প্রকৃতির এই অগ্নুত্তপ্ত রূপের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা যায় না, চোখ ঝলসাইয়া উঠে।

গাড়ীতে কেহ ছিল না, সব কয়টি খড়খড়ি বন্ধ করিয়া নিজেকে এলাইয়া দিলাম। অনেকটা সময় বোধ হয় এই ভাবে কাটিয়া গিয়াছিল—আমার গন্তব্য স্থলে আসিয়া পড়িয়াছি জানিতে পারি নাই। দরজা ঠেলাঠেলিতে তন্দ্রাবেশ কাটিয়া গেল। জানালা খুলিয়া দেখি ডিণ্ডভামেটায় আসিয়াছি। স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট ফরেষ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটারমনী তাঁহার এলাকার রেঞ্জার ও অন্যান্য লোক ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—তাহাদের সাহায্যে মাল নামাইতে কোন অসুবিধা হইল না। ফরেষ্ট রেষ্ট হাউস ষ্টেশন হইতে নিকটে নয়। বেলা তখন চারটা হইবে। রৌদ্ররশ্মির অপূর্ব্ব রূপ দেখিলাম—সবুজের চিহ্ন মাত্র কোথাও দেখা যায় না। পাকা রাস্তার পাশে ঘাস শুকাইয়া পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করিয়াছে, দগ্ধ পাথরের উত্তাপ সাধারণ টেনিস জুতার রবারকে প্রায় গলাইয়া ফেলিতেছিল। মাথার উপর অগ্নি বর্ষণ হইতেছে। কোন প্রকারে দেহটা টানিয়া হেঁচড়াইয়া বাংলোয় টানিয়া তুলিলাম। ডি, এফ, ও, আমার অভ্যর্থনার জন্য বারন্দাতে দাঁড়াইয়াছিলেন—ভদ্রতার অনুষ্ঠানগুলি শেষ হইতেই বলিলাম—আমার জ্বর বাড়িতেছে, বিশ্রামের প্রয়োজন।

তিন দিন জ্বর ভোগের পর স্থানীয় ডাক্তারের কৃপায় চতুর্থ দিনে পথ্য পাইলাম। পথ্যের পরেই শিকারে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়া ডি, এফ, ও, স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন—গতিক সুবিধার নয়; তাঁহার সাহায্য ব্যতীত কোন বন্দোবস্ত হইতে পারে না। সুতরাং কথাটা তখনকার মত চাপিয়া গেলাম। ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে লেপার্ড ছোট মহিষ ও কুকুর মারার খবর আসিতেছিল—আমি গোপনে সংগ্রহ করিতেছিলাম; কিন্তু বড় বাঘের থাবার চিহ্ন কেহ দেখিয়াছে বলিল না।

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, এ তল্লাটে বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল না। ডি, এফ, ও, সাহেবও

ট্যুরে বাহির হইয়া গিয়াছেন—অবশ্য রেঞ্জ অফিসার বোপাইয়কে আমার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গিয়াছিলেন। খবর নাই, কাজ নাই, অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিলাম। এক দিন প্রাতে অপ্রত্যাশিত-ভাবে রেঞ্জার আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন—শুভ সংবাদ! মালকোণ্ডা পেণ্টা হইতে খবর আসিয়াছে—ওখানে এক বিরাট আকারের বাঘ নাকি রোজ পেণ্টার (ক্ষুদ্র জলাশয়) দিকে জল খাইতে যায়।

শিকারী বেশে লেখক। পশ্চাতে ব্যাঘ্রচর্ম্ম

রেঞ্জারকে বলিলাম, আর কাল-বিলম্ব নয়, এখুনি রওনা হইবার ব্যবস্থা করুন। তিনি উত্তর করিলেন—এখন রওনা হইলে মালকোণ্ডা পেণ্টায় পৌছিতে বেলা একটা বাজিয়া যাইবে—এই রৌদ্রে কোন গাড়োয়ান ১০ মাইল পথ যাইতে রাজি হইবে না। কাল সকালে অন্ধকার থাকিতে রওনা হইবার ব্যবস্থা করিতেছি।

অগত্যা তাঁহার কথা মানিয়া তখন হইতেই পরের দিনের ভোরের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম—যাহোক একটা কাজ পাওয়া গেল—প্রস্তুত হওয়ার সহিত জঙ্গলের নানা কাল্পনিক রূপ মনশ্চক্ষে দেখিতেছিলাম।

১৬ই মে অন্ধকার থাকিতেই ওয়েষ্টলী রিচার্ডের ৪২৫ বোর এবং কেলনারের ৩৫৫ বোর রাইফেল দুইটা পরিষ্কার করিলাম—ফরাসী দোনলা বন্দুকের ভিতরটা তাচ্ছিল্যের সহিত দেখিয়া লইলাম। দোনলাটা মাল-বাহকের হাতে তুলিয়া দিয়া রাইফেল দুইটা নিজের কাছে রাখিলাম। হাজার হোক রাইফেলের জাতিগত আভিজাত্য আছে, তাহা ক্ষুণ্ণ করি কেমন করিয়া! জড়কেও জাতির অন্তর্ভুক্ত করায় ফলাফল সুবিধার হয় নাই। পরের ঘটনায় তাহা জানা যাইবে।

আমরা যখন মালকোণ্ডা পেণ্টায় উপস্থিত হইলাম তখন দুপুর বারটা, অসুস্থ শরীরের কথা ভুলিয়াছি; রৌদ্রের উত্তাপে আবেষ্টমী তখন অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—সেদিকে লক্ষ্য নাই, বলিলাম পাগ মার্ক দেখিতে যাইব। ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—এখন সেখানে যাওয়া অসম্ভব। এখান হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ পথ, পৌঁছিতে বেলা দুইটা বাজিয়া যাইবে—ফিরিতে চারটা। তৎ-পরিবর্ত্তে কাল সকালেই মণ্ডড়ায় মাচান তৈয়ারী করিয়া রাখিব। আপনি বৈকালে বাঘের পদচিহ্ন দেখিয়া মাচানে বসিতে পারিবেন। ও রাস্তায় মানুষ চলে না। প্রস্তাবটা মন্দ লাগিল না। মাচানে বসার আশু সম্ভাবনায় পুলকিত হইয়া উঠিলাম।

এখানকার রেষ্ট হাউসে কোন জমকালো ভাব নাই। মাত্র দুইটি ঘর, কোনটারই কবাট বন্ধ করা যায় না—যে কোন হিংস্র জানোয়ার নির্ব্বিবাদে ঝড়বৃষ্টিতে আশ্রয় লইতে পারে। আশ্রয় না লউক শিকারের সন্ধানে হরিণ অথবা শূকরের পিছনে ধাওয়া করিয়া ব্যর্থ হইলে এমন একটি অন্ধকার-পূর্ণ আস্তানা পাইলে খানিকটা জিরাইয়া লইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি আছে? ভাবিলাম ডি, এফ, ও, রায়-মহাশয় পশুরাজ শার্দ্দুলের দর্শন নিজের টেবিলের তলায় পাইয়াছিলেন; কুকুর ভাবিয়া তাড়াইতে গিয়া একেবারে রাজদর্শন! তিনি জাগিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় বাঘ যদি অভ্যর্থনা করিতে আসে তখন বন্দুক চালাইবারও অবসর পাইব না।

রাত্রির কথা, যৎসামান্য আহার করিয়া রেষ্ট-হাউস-সংলগ্ন স্বল্প পরিসর খোলা বারান্দার মেঝেতে সকলের শুইবার ব্যবস্থা হইল। মিঃ জন আমার পাশে শুইলেন—উভয়ে বন্দুক ভরিয়া পাশে রাখিলাম। সবে নিদ্রা আসিতেছিল এমন সময় দেখিলাম সামনের জঙ্গল আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে—চার ধারে পোড়া গন্ধ ও বাঁশ ফাটার দারুন আওয়াজ, কতকটা কুচ্‌কাওয়াজে একসঙ্গে অনেক বন্দুক চালানর মত। তাড়াতাড়ি উঠিয়া জনকে জাগাইলাম। সে দৃশ্যটি দেখিয়াই রেঞ্জারের

নিকট ছুটিল। আমি বারান্দা হইতে নামিয়া ঘরের পিছন দিকে গেলাম—দেখি জঙ্গলে—আগুন লাগিয়াছে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আকাশ ঠেলিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে সর্ব্বগ্রাসী আগুন আমাদের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। মহাশক্তিমান রাক্ষস ক্রমান্বয়ে কলেবর বিস্তারিত করিয়া চলিয়াছে—আতঙ্কিত হইয়া উঠিলাম।

ইতিমধ্যে রেঞ্জার দলবল সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আগুনের রূপ দেখিয়াই প্রায় সামরিক কায়দায় হুকুম দিলেন—"কাউণ্টার ফায়ার!" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার লোকগুলি সার বাঁধিয়া শুকনা ঘাসে রেষ্ট হাউসের গা ঘেসিয়া আগুন লাগাইয়া দিল। অল্পক্ষণের ভিতর আমাদের দিককার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং পূর্ব্বের অগ্রগামী অগ্নির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিপরীতমুখী আগুনের গতি একত্রে মিলিত হইতেই হাওয়ার গতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমান্বয়ে আগুনকে দূরে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলাম।

পরের দিন পেণ্টার মণ্ডড়ার নিকট মাচানে গিয়া বসিলাম। মাচানটি ঠিক মনঃপুত হইয়াছিল বলিতে পারি না—প্রথম বাঘের লাফ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়, তদুপরি আড়াল হইতে নজরে পড়ে। সহজে মাচানে উঠিয়া এক পার্শ্বে খানিকটা জায়গা খালি রাখিয়া দিলাম,—ঠিক নীচে বাঘ আসিলে যাহাতে সহজেই গুলি চালাইতে পারি। ইহার প্রয়োজনীয়তা অভিজ্ঞতা হইতে বোধ করিয়াছিলাম। মামুন্তরে (চিত্তুর জেলা) মাচানের তলায় বাঘ বাঁধা মহিষকে মারিবার জন্য প্রায় ঘণ্টাখানেক বসিয়াছিল—শেষ পর্য্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, আমি কিছুই করিতে পারি নাই। গুছাইয়া বসিয়া মাল-বাহকদের জোরে কথা বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতে বলিলাম।

ধীরে গোধূলির ক্ষীণ আলোক তিরোহিত হইয়া রাত্রির অন্ধকার আমাদের ঘিরিতে লাগিল। সাংঘাতিক গুমট, হাওয়া নাই, শব্দ নাই, অরণ্যে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া যাইতেছে। জনকে রাত্রি জাগিবার জন্য সঙ্গে আনিয়াছিলাম—পরে তাহার রাত্রি জাগিবার ক্ষমতা দেখিয়া স্তম্ভিতও হইয়াছিলাম। উভয়েই নিশ্চল ভাবে বসিয়া আছি—সামনের জঙ্গলে শুকনা পাতার উপর এক সঙ্গে অনেকগুলি জন্তুর পদশব্দ শুনিলাম। অনতিকাল পরেই বুঝিলাম জন্তুগুলি একপাল বন্য বরাহ—মিনিট পনর এদিক ওদিক ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া সদলবলে চলিয়া গেল।

বরাহগুলি চলিয়া যাইতে, কাল্পনিক বাঘকে বাঁধা মহিষের নিকট দাঁড় করাইয়া ৪২৫ বোরের রাইফেল দিয়া টিপ করিবার চেষ্টা করিলাম। বন্দুকের দৈর্ঘ্য অস্বস্তিকর হইয়া উঠিল—মাচানের ভিতর ইচ্ছামত নাড়াইবার উপায় নাই। তাহার উপর মাচান এমন খাড়াই স্থানে বাঁধা হইয়াছে যে বাঘের শিরদাঁড়া ছাড়া আর কিছু ভাল ভাবে দেখিতে পাইব না। যাক, গতস্য শোচনা নাস্তি,—এখন আর ত্রুটির কথা ভাবিয়া লাভ নাই। নিস্তব্ধতার মাঝে চিন্তাস্রোত বাঘকে কেন্দ্র করিয়াই

আবদ্ধ ছিল না। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুম আসিতে লাগিল—ক্লান্ত ও অসুস্থ শরীর লইয়া বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। জনের দেহে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সাঙ্কেতিক স্পর্শ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম মনে নাই, হঠাৎ জন প্রায় নখী জন্তুর মত খামচাইয়া আমাকে জাগাইয়া দিল। শিকারের অভ্যাস অনুসারে সন্তর্পণে উঠিলাম—বসিবার পূর্ব্বেই শুনিলাম ঠিক আমার মাথার পাশে পূর্ব্ববর্ণিত খালি জায়গাটায় হুড়ামুড়ি চলিয়াছে, জনের দেহ সাংঘাতিক ভাবে দুলিতেছে। পকেটেই ছোট টর্চ ছিল, সুইচ টিপিতে দেখি জন তাহার বন্দুকের বাঁট খোলা জায়গাটার ভিতর চালাইয়া দিয়া কোন একটি জন্তুকে ধপাধপ পিটাইতেছে—যথাস্থানে আলো ফেলিয়া আবিষ্কার করিলাম একটি প্রকাণ্ড ভালুক মাচানের এক হাত নীচে আমার সোলার হ্যাটটা কামড়াইবার চেষ্টা করিতেছে আর জন বন্দুকের বাঁট দিয়া সেটাকে নীচে নামাইবার জন্য পিটিতেছে। আলো ভিন্ন দিকে ঘুরাইতে দেখি প্রথমটার নীচে আর একটা, তাহার পর আরো একটা এবং গাছের গোড়ায় চার-পাঁচটা জড় হইয়াছে—একেবারে ভালুকের পণ্টন!

মাচানের উপর যে ধস্তাধস্তি হইয়া গেল তাহাতে বাঘ ত্রিসীমানায় থাকিলে ভৌতিক গুণসম্পন্ন বৃক্ষের নিকটে আর আসিবেনা। স্ত্রীর কথা মনে পড়িয়া গেল—"ভালুক পেলে তাই মেরো—বাঘের আশায় ভালুক ছাড়া চলবে না, ওর চামড়ায় ড্রইংরুমের সামনে খাসা পা-পোষ হবে"। ক্ষিপ্রতাসহ বড় রাইফেলটা ঘুরাইবার চেষ্টা করিলাম, অস্ত্র ঘুরিল না অধিকন্তু তৎসংযুক্ত আলোর তার ছিঁড়িয়া গেল। নিরুপায় হইয়া পাশেই দাঁড়-করান দোনলা বন্দুকটা খালি জায়গাটার ভিতর ঢুকাইলাম, পণ্ডশ্রম হইল, ইতিমধ্যে সব কয়টা ভালুক গাছের নিকট হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। শুকনা পাতার আওয়াজ শুনি নাই, ভাবিলাম নিকটেই আছে। বন্দুক রেডি করিয়া জনকে মাচানের উপর দাঁড়াইয়া টর্চ জ্বালিতে বলিলাম, তাহার পর আলোর সাহায্যে চার ধার খুঁজিলাম, কোন দিকে তাহাদের দেখিতে পাইলাম না। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, ভালুক তো মানুষের নিকট প্রহার খাইয়া অত সহজে পলাইবার পাত্র নয়! তাছাড়া পলাইল কোন দিক দিয়া?—জঙ্গলের দিকে পলাইলে পাতার শব্দ শুনিতাম; তবে পাকা সড়ক দিয়া পলাইয়াছে। ভয় না পাইলে পাকা সড়ক ধরিবে কেন? ভয় পাওয়া অশোভনীয় নয়, যে ভাবে টর্চের আলো ব্যবহার হইয়াছে তাহাতে ভড়কানই স্বাভাবিক।

ইহার পর ইসারা অথবা চুপি চুপি কথা বলার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলাম না। বড় বাঘ সম্বন্ধে নিরাশ হইলেও লেপার্ড ভোরের দিকে আসিতে পারে ভাবিয়া ছোট রাইফেলটা 'গন রেষ্টে' সাজাইয়া রাখিলাম। দুই একবার আলোটাও পরীক্ষা করিয়া লইলাম। তাহার পর সিগারেট ধরাইয়া মনের সুখে ধূম পান করিলাম। সিগারেটের শেষ অংশ ভিজা কাপড়ের সংস্পর্শে

আনিয়া নিভাইতে যাইব এমন সময় অতি পরিচিত পদধ্বনি ঠিক মাচানের পাশে শুনিলাম। জনকে টিপিয়া সাবধান হইতে বলিলাম ; সে সঙ্কেতের অর্থ বুঝিল না, সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল—"কি ?" আমি তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিলাম—"বাঘ আমাদের অতি নিকটে আসিয়াছে, যে কোন মুহূর্ত্তে মহিষটার উপর লাফ মারিতে পারে। আমার দোনলাটা লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাক।"

কথাটা শেষ করিয়াছি এমন সময় আর এক পা চলিবার শব্দ স্পষ্ট শুনিলাম। তখন আমি রাইফেল বগলে তুলিয়া লইয়াছি এবং লক্ষ্যের আনুমানিক স্থানের দিকে নল ঠিক করিয়া ধরিয়াছি। গোলমালের পর বাঘের আগমন—ভাবিয়াছিলাম হয়ত বা মামুনডুরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইবে কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। হঠাৎ মহিষটা ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিল, দু-এক সেকেণ্ডের ঝটাপটি, তাহার পর ভারী ওজন মাটিতে ধপ্‌ করিয়া পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল সংযুক্ত টর্চ্চের সুইচ টিপিয়া দিলাম, সামনেই প্রকাণ্ড বাঘ, অত নিকটেও খুব স্পষ্ট দেখিতেছি না—বাঘ ও মহিষের ঝটাপটিতে যে ধূলা উড়িয়াছিল তাহাতে ঘন ধোঁয়ার মত পর্দ্দা সৃষ্টি করিয়াছে বাঘের মাথাও বিপরীত দিকে ঘোরান, বুক লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া টিপিয়া দিলাম। গুলি খাইয়া বাঘ খাড়া ভাবে লাফাইয়া উঠিল। মাটিতে পড়িয়া আর উঠিতে পারিল না। ইতিমধ্যে আর একটা গুলি চালাইয়া শিকার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে চাহিয়াছিলাম। ম্যাগাজিন রাইফেলে গুলি ভরিয়া নিশানা করিবার পূর্ব্বে বাঘ জনের দিকে গড়াইয়া গেল।

জনকে অনবরত টিপিতেছি গুলি চালাইবার জন্য, সে বন্দুকের নলটা একবার এদিক একবার ওদিক করিতেছে। ইতিমধ্যে বাঘ তাহারই দিকে আবার আছাড় খাইয়া পড়িল তাহার পর আমাদের মাচানের পিছনে চলিয়া গেল। বেশী দূর যাইতে পারে নাই—আবার পড়িয়া গেল। ইহার পর বার তিন গোঙানি শুনিলাম—পরে কিছুক্ষণের জন্য বনানী অসম্ভব নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। দূরে একটি শুক্‌না পাতা পড়িলেও তাহার আওয়াজ স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি—থাকিয়া থাকিয়া হৃদয় ভয়মিশ্রিত উত্তেজনায় আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে। বেশীক্ষণ এই ভাবে কাটিল না, পাতার শব্দে স্পষ্ট বুঝিলাম বাঘ আবার উঠিয়াছে এবং চলিতেছে। ধীরে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর-ধ্বনি ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল কিন্তু শব্দ বিলীন হইবার পূর্ব্বে পুনরায় পতনধ্বনি শুনিলাম—এবার আর সন্দেহ থাকিল না বাঘ মরিয়াছে। জনের দিকে হেলিয়া বলিলাম—"বাঘ মরিয়াছে।"

আমাদের মধ্যে কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্‌ এবং থ্যাঙ্কস্‌-এর আদান-প্রদান হইয়া গেল। হৃষ্টচিত্তে শুইলাম। উত্তেজিত হইয়াছিলাম, ঘুম আসিতেছিল না। প্রিয়ার জন্য বাঘের নখ ও দন্তের সাহায্যে নূতন রকমের গহনার ডিজাইন্‌ মনে মনে আঁকিতে লাগিলাম। আমার কারুশিল্পের

দক্ষতা রুচিসম্পন্ন নারীমহলে কি ভাবে প্রচার লাভ করিবে তাহাই ভাবিতেছিলাম। ভবিষ্যতে আমার স্ত্রী যে শিকারে আমায় বাধা দিবেন না—সে বিষয়েও কতকটা নিশ্চিন্ত যে হই নাই তাহা বলিতে পারি না। চক্ষু বুঁজিয়া পড়িয়া আছি, ঘুমও আসিতে চায় না ভোরও হয় না। আন্দাজ তিন ঘণ্টাকাল অর্দ্ধনিদ্রা এবং অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় কাটিয়া যাইবার পর আকাশ পরিষ্কার হইতে লাগিল—অর্থাৎ যখন গুলি চালাইয়াছিলাম তখন রাত দুইটা হইবে।

অসহিষ্ণু ভাবে সকালের আলোর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। তখন ভোর ৬টা হইবে, দূরে মাল বাহকদের গলা শুনিলাম। রাত্রে গুলি চলিয়াছে, কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া সময়ের আগেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। জনকে চিৎকার করিয়া বলিতে বলিলাম জখুমি বাঘ পড়িয়া আছে, রোদ না উঠিলে যেন এদিকে না আসে। জন মাচানের উপর দাঁড়াইয়া চার ধার ভাল করিয়া দেখিল, তাহার পর বিমর্ষভাবে বলিল—কৈ বাঘ তো নাই। আমি বলিলাম—"পিছন দিকে একটু দূরে পড়িয়াছে, খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে।" বাঘ মরিয়াছে সে বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সন্দেহ ছিল না, সেই কারণেই অতটা জোর দিয়া বলিতে পারিয়াছিলাম।

সামান্য রোদ উঠিতেই আমি ডবল ব্যারেল গান-এ তিন ইঞ্চি এল-জি গুলি পুরিয়া নামিয়া আসিলাম,—জন আমার ছোট রাইফেল লইয়া নামিতেছিল। বারণ করিলাম, রাইফেল কোন কাজে আসিবে না। বাঘ যদি এখনও বাঁচিয়া থাকে এবং আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে তো উড়ন্ত স্নাইপ পাখী মারার মত হঠাৎ গুলি চালাইতে হইবে, রাইফেল দিয়া টিপ করিবার সময় পাওয়া যাইবে না। যুক্তিটি বোধগম্য হইতে রাইফেল রাখিয়া নিজের বন্দুকটিরও টোটা বদল করিয়া ফেলিল। জনকে উপরে থাকিতেই বলিলাম দূরবীন ছাড়া জলটুপি ইত্যাদি কিছু সঙ্গে না লইতে। প্রয়োজন হইলে চোঁচা দৌড় মারিতে হইবে।

আমি জানিতাম বাঘ নিকটেই পড়িয়াছে ১০।১৫ মিনিটের ভিতর খুঁজিয়া পাইব। মাচানের সামনে পতনের স্থানগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—রাইফেল নিজের জাতের মান রাখিয়াছে, যেখানে বাঘ গুলি খাইয়াছিল ঠিক তাহার নিকটে একটি নাতিবৃহৎ পাথরের চাঁই টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। পদ-চিহ্ন দেখিতে দেখিতে পিছন দিকে গেলাম—যেখানে জন্তুটা বেশ খানিকক্ষণ পড়িয়া ছিল। এই স্থান হইতেই রক্তস্রাব সুরু হইয়াছিল—প্রায় ঘটিখানেক রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। আমাদের মাচানের গাছকে কেন্দ্র করিয়া খানিকটা জায়গা ফাঁকা ছিল, তাহার পরই খাড়া শুক্‌না ঘাস—একেবারে বাঘের গায়ের রং—উহার ভিতর বড় বাঘ দুই গজের মধ্যে আত্মগোপন করিলে, দিব্য দৃষ্টি না থাকিলে খুঁজিয়া বাহির করা অসাধ্য কর্ম্ম। রক্তের দাগ ঐ খাড়া ঘাসের দিকেই চলিয়া গিয়াছে।

মাল-বাহক লামবাড়িরা নিকটে ছিল। আমাদের পিছন হইতে ঢিল ছুঁড়িতে বলিলাম—আর আমরা একপা দুইপা করিয়া রহস্যময় ও ভীতিপ্রদ ঘাসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ঘাসের নিকটে আসিতে অবর্ণনীয় আতঙ্কে প্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছিলাম। অশুভ লক্ষণ, জোর করিয়া নিজেকে টানিয়া লইয়া চলিলাম; খানিকটা পথ অতিক্রম করিতে খাড়া ঘাসে রক্তচিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। প্রায় তিন ফুট উচ্চ সরল রেখার ন্যায় রক্তের দাগ রাখিয়া গিয়াছে। কিছু দূর অগ্রসর হইতে আবার খানিকটা খোলা জায়গা সামনে পড়িল—এইখানে লামবাড়িরা দুই একদিন আগে রান্না করিয়া আহারের ব্যবস্থা করিয়াছিল, শুক্‌না ছাই ও পোড়া কাঠের টুক্‌রা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বাঘ এইখানে বসিয়াছিল, নরম ছাইয়ের উপর তাহার চলার ভঙ্গী জনকে দেখাইলাম। বাঁ দিক্‌কার পা একেবারে জখম হইয়াছে অর্থাৎ তাহার অস্থি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সমস্ত পা-টাই মাংসপেশী অথবা চামড়ায় ঝুলিতেছে। চলিবার পথে সামান্য একটি পোড়া কাঠের টুক্‌রা পড়িয়াছিল তাহাও পায়ের সহিত ঘষ্‌টাইয়া খানিকটা চলিয়া গিয়াছে—এইখানেই আমার খট্‌কা লাগিয়া গেল।

জন আমার আগে ছিল তাহাকে থামিতে বলিলাম, লামবাড়িদের ঢিল ছুঁড়িতে বারণ করিলাম। জন নিকটে আসিতে দেখাইলাম হৃদয়ে গুলি লাগে নাই—বাঘ কাঁধের নিকট জখম হইয়াছে। যে জানোয়ার এতটা হাঁটিয়া আসিয়াছে তাহার শক্তিকে অবিশ্বাস করা বাতুলতা, তদুপরি তাহার গন্তব্যস্থান অনতিদূরে পেণ্টার দিকে, ওখানে যেরূপ ঘন বাঁশের ঝোপ তাহাতে এই কয়টি লোক লইয়া অগ্রসর হওয়া ঠিক হইবে না। জনকে বলিলাম জঙ্গলী চঞ্চুদের ডাকো। জনের নিকট হইতে দূরবীন লইয়া আনুমানিক সন্দেহের স্থান লক্ষ্য করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঝোপের তলায় যেখানে আলো পাইতেছি সেখানেই পরীক্ষা করিতেছি যদি তাহাকে পাওয়া যায়।

বাঘের স্বভাব তাড়া খাইলে অনেক সময় কোন একটি আড়ালের পিছনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহার পর নিরাপদ ভাবিলে এক ঝোপ হইতে অপর ঝোপে বুকে হাঁটিয়া চলিয়া যায়। আমাদের গতি থামিয়া গিয়াছিল—ভাবিলাম এই বার হয়ত নড়িবে—অনুমান ভুল হয় নাই পুনরায় দূরবীন লাগাইতেই দেখিলাম আন্দাজ তিন ফারলং দূরে বাঘ দাঁড়াইয়াই চলিতেছে এবং বাঁ পা-টা ঝুলিতেছে। রাইফেল নিকটে থাকিলে এবং শুধু চোখে অতটা দূরে নিশানা সম্ভব হইলে এইখানেই বাঘ পাইয়া যাইতাম। মনে মনে হাওদায় চড়া শিকারীদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলাম। এখন হাতীর দ্বারা 'বীটিং' করিলে শিকার কি অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিত? তিনটি লোক চঞ্চুদের ডাকিতে চলিয়া গেল, আমরা জঙ্গলের পাকা রাস্তার ফাঁকায় আসিয়া বসিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পরে তিন জনই ফিরিয়া আসিয়া বলিল সব চঞ্চু বাঁশ কাটিতে কূপে চলিয়া গিয়াছে।

এ অবস্থায় বাঘকে ছাড়িয়া গেলে আর উহাকে পাওয়া যাইবে না। জনকে বলিলাম—"আমরা যদি এই কয় জনে বাঘের পিছনে যাই তো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা খুব বেশী। তুমি আমার সঙ্গে যাইতে রাজী আছ ?" জন নিজে একটি বাঘ মারিয়াছিল, তাহার অতিরঞ্জিত ইতিবৃত্ত আমাকে বার তিনেক শুনাইয়াছিল, বলিল—"মাচান হইতে বাঘ মারিয়াছি সত্য, কিন্তু এ যে জখুমি বাঘ আর মাত্র দুইটা বন্দুক...."

তাহার কথা শুনিয়া আমিও দোমনা হইয়াছিলাম—কিন্তু অত বড় বাঘ সচরাচর দেখা যায় না, মারিতে পারিলে....! ভাবিলাম—দিনের বেলা আমার নিশানা ভুল হইলে বন্দুক ধরাও উচিত নয়। লক্ষ্য-ভেদের অহমিকা আমাকে তেজীয়ান্ করিয়া তুলিল, উত্তর দিলাম—"আমার নিশানা রেষ্ট হাউসে দেখ নাই ? তা ছাড়া সঙ্গে দোনলা রহিয়াছে—তোমার কাছে আর একটা বন্দুক, বাঘ তিনটা গুলি হজম করিয়া ফেলিবে ?"

আমার তাগমারীর কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে সত্যই জন মনে বল পাইল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চলুন।

সড়ক দিয়াই চলিতে লাগিলাম, কিন্তু জনকে পাশের খাড়া ঘাসের দিকে নজর রাখিতে বলিলাম। অনেক সময় বাঘকে সাম্‌নে দেখা গেলেও শিকারীর অলক্ষ্যে কেমন করিয়া পিছনে গিয়া উপস্থিত হয় এবং আক্রমণ করে। বলিয়া দিলাম, পাশের খাড়া ঘাস দূরে অথবা নিকটে নড়িতে দেখিলেই বুঝিবে বিপদ সন্নিকট।

পূর্ব্ববর্ণিত ঝোপের নিকটে আসিতে বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিতেছিল। ক্রমান্বয়ে হৃৎকম্পন দারুণ ভাবে বাড়িয়া চলিল—আশঙ্কান্বিত হইয়া পড়িতেছিলাম পাছে মনোভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে।.... ঝোপের আরো নিকটে যাইতে উভয়ে প্রস্তুত হইয়া ঢিল ছুঁড়িতে বলিলাম। যে ঝোপ দূরবীন দ্বারা পূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়াছিলাম সেইখান হইতে বাঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাহার পরই ঝোপের বিপরীত দিক মৃদু দুলিতে দেখিলাম—বাঁচা ও মরার মীমাংসা কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে হইয়া যাইবে—আমি ঝোপের দিকে তাকাইয়া আছি এমন সময় জন গুলি চালাইয়া দিল—ফিরিয়া দেখি কতকটা আমাদের পিছন দিকে খোলা জায়গায় একটি উঁচু টিলার অপর পার্শ্বে বাঘ গড়াইয়া পড়িয়া গেল। জন ও বাঘের মাঝে যে ব্যবধান ছিল তাহা দুই শত গজের উপর হইবে তো কম হইবে না। জন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, নিকটে আসিয়া বলিল—তাহার গুলিতে বাঘ মরিয়াছে। আমিও খুশী হইয়া উঠিয়াছিলাম—বাঘটা শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল !

খানিকটা অগ্রসর হইতেই সাধারণ এল-জি টোটা ও বন্দুকের পাল্লার কথা মনে পড়িয়া গেল। থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম, জনকে হাতছানি দিয়া তাড়াতাড়ি পিছাইয়া আসিতে বলিলাম। আমার

এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহার দেখিয়া লোকগুলি কি ভাবিয়াছিল জানি না—জন নিকটে আসিতে বলিলাম—"তোমার গুলিও লাগে নাই বাঘও মরে নাই। সাধারণ এল. জি-র পাল্লা অতটা হইতে পারে না—গুলি যদি ওখানে পৌঁছাইয়া থাকে তো মাটিতে গড়াইয়া গিয়াছে। বাঘ তিন পায়ে চলিতেছে কোন কিছুতে ঠোক্কর খাইয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে—এখন ফের।" জনের মুখ দেখিয়া মনে হইল সে আমার কথা বিশ্বাস করে নাই। আমাকে একজন পরশ্রীকাতর ব্যক্তিও ভাবিয়া থাকিতে পারে।

বেলা এগারটার কাছাকাছি। ইতিমধ্যে রাস্তা তাতিয়া উঠিয়াছে। পেণ্টা হইতে রেষ্ট হাউস প্রায় চার মাইল পথ পাড়ি দিতে হইল। রেষ্ট হাউসে ফিরিতেই অনুভব করিলাম মাথাটা বেশ ধরিয়াছে—তথাপি নিজ হাতে মারা বাঘের লোভ সামলাইতে পারিলাম না, রেঞ্জারকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। তিনি লোকজন সংগ্রহ করিয়া বৈকালে যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বেলা বাড়ার সহিত শরীর উষ্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, ম্যালেরিয়া যে ধুম করিয়া আসিতেছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিল না। বৈকালে আমার যাওয়া হইল না।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে রেঞ্জার আমার দোনলাটা ও জনকে লইয়া সদলবলে চলিয়া গেলেন। বেলা পড়িয়া আসিতে দুই বার বন্দুকের আওয়াজ শুনিলাম, জঙ্গলে গুলি চলিলে চার পাঁচ মাইল দূর হইতে শব্দ শোনা যায়। উদ্গ্রীব হইয়া খবরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, সন্ধ্যার আগেই সকলে ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে বাঘ নাই। কোথায় গুলি লাগিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিতে রেঞ্জার সাহেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তিনি বাঘকে গুলি মারেন নাই, শূন্যে আওয়াজ করিয়াছিলেন—জন্তুটাকে বাহির করিয়া আনিবার জন্য। বাঘ বাহির হয় নাই, তাহার ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনিয়া সব লোক পলাইয়া আসিয়াছিল। পরে আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কাল অফিসার ভাল থাকিলে নিজে গিয়া চেষ্টা করিতে পারেন।

আজকালকার দিনে দুইটি তিন ইঞ্চি এল-জি টোটা শূন্যে উড়াইয়া দেওয়া! তদুপরি অম্লান বদনে যাহাকে বাঘের পিছনে ধাওয়া করিবার প্রস্তাব করিলেন সে তখন জ্বরে ধুঁকিতেছে। সকালে চঞ্চুদের পেণ্টায় পাঠাইয়াছিলাম তাহারা ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল—বাঘ পলাইয়াছে। বাঘের বুদ্ধির তারিফ করিতে হইল।

দুই দিন জ্বরের সহিত বোঝাপড়া করিয়া তৃতীয় দিনে 'হেড কোয়ার্টাসে' ফিরিয়া আসিলাম। দেহ মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—মাদ্রাজে ফিরিবার বন্দোবস্ত করিতেছি। ইহারই ভিতর একটি সুখবর আসিয়া পৌঁছিল—বড় বাঘ ডিগুভামেটার নিকটেই সরকারী রাস্তার উপর কয়দিন ধরিয়া চলাফেরা

করিতেছে। সঙ্গে দুইটি বড় বাচ্চাও আছে। স্থানীয় শিকারী উপদেশ দিল একটু দূরে গেলে তিনটি রাস্তার সঙ্গমস্থল, ঐ মওড়ায় মহিষ বাঁধিলে—যে দিক দিয়াই বাঘ চলুক না কেন মহিষকে মারিবেই। প্রস্তাবটি ভালই লাগিল, অনিশ্চিত 'লাইভ বেট' (Live bait)-এর উপর বসিবার উৎসাহ অথবা ক্ষমতা ছিল না, বলিলাম—মহিষ ঐখানেই বাঁধা হউক, যদি মারে তো কিল্'-এর উপর বসিব—এখন মাচান বাঁধার কোন দরকার নাই।

যেরূপ কপাল লইয়া শিকারে আসিয়াছিলাম, তাহাতে কোন আশাই পোষণ করা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। দুই দিন কাটিয়া গেল, বাঘ মহিষকে মারিল না, বিরক্ত হইয়া রেঞ্জারকে বার্থ রিজার্ভ করিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলাম—দুই দিন পরেই রওনা হইব। ভাবিতেছিলাম আমার ব্যর্থতার অজুহাত লইয়া বেদরদীরা বলিয়া বেড়াইবে বাঘ শিকার একটা বাজে কথা—আসলে লেখার সখ মিটাইবার জন্য জঙ্গলে যায়! গভীর অরণ্যে রাতের বেলা বাঘের সামনে মুখোমুখি হইয়া গুলি চালান চারটিখানি কথা! বেদরদীরা কি জানে আমি যেভাবে শিকার করি তাহা নিরবচ্ছিন্ন ভাগ্যের ব্যাপার। এ দিক দিয়া হাওদায় চড়া শিকারীরা কতটা বেশী সুবিধা পায় তাহা অভিজ্ঞ শিকারী মাত্রেই জানেন। এ বিষয়ে বেশী লিখিয়া নিজের দুর্ভাগ্য অধিকতর পীড়াদায়ক করিয়া তুলিতে চাই না।

পরের দিন সকালে বসিয়া আছি এমন সময় একটি লামবাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বলিল—বাঘ মহিষকে মারিয়াছে এবং বাঁধন ছিঁড়িয়া গভীর জঙ্গলের ভিতর টানিয়া লইয়া গিয়াছে। কালবিলম্ব না করিয়া রেঞ্জারকে ডাকিতে বলিলাম। তিনি আসিতে, লোক জন দিয়া মহিষটাকে পুনরায় যেখানে মারিয়াছিল সেখানেই আমার ইস্পাতের নমনীয় তার দিয়া বাঁধিতে বলিয়া দিলাম এবং মরা মহিষের নিকটেই মাচানের বন্দোবস্ত হওয়া দরকার জানাইয়া দিলাম।

বেলা পড়িতে ছোট রাইফেল এবং দোনলা বন্দুক লইয়া গরুর গাড়ীতে উঠিলাম। গম্যস্থল নিকট হইলেও হাঁটিবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

মওড়ায় পৌছিয়াই মরা মহিষটাকে কি ভাবে বাঘ খাইয়াছে পরীক্ষা করিলাম। পিছন দিককার একপাশ সব নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে, সন্দেহ রহিল না যে বাঘেই মারিয়াছে—(লেপার্ড সামনের দিক হইতে খাইয়া থাকে)। কিন্তু মাচানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দমিয়া গেলাম, অত্যন্ত নীচু। আক্রমণকালীন বাঘকে কষ্ট করিয়া লাফাইতে হইবে না, সামনের পা বাড়াইয়া সমস্ত মাচানটা মাটিতে নামাইতে পারে; একেবারে পল্কা গাছ। এখন আর ওকথা ভাবিয়া লাভ নাই। জনকে সঙ্গে আনিয়াছিলাম, তাহাকে জল ইত্যাদি সরঞ্জাম লইয়া আগে উঠিতে বলিলাম। আড়ালের জন্য পাতাগুলি যথাসম্ভব ঠিক করিয়া লইয়া বেলা থাকিতেই মাচানে গিয়া বসিলাম।

বৈকাল হইতে উত্তর-পশ্চিম কোনে মেঘ জমিতেছিল। হাওয়ার গতিও প্রবল হইয়া উঠিতেছিল—ঝড়ের পূর্ব্বসঙ্কেত। অল্পক্ষণ পরেই জোর হাওয়া থামিয়া গিয়া গুমট আসিয়া পড়িল। তখন বেশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ হনুমান আতঙ্কের ডাক সুরু করিয়া দিল। এবার আর রাইফেল নয়, দোনলাটা লইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিলাম, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই বাঘ গর্জ্জন করিয়া অভুক্ত খাদ্যের উপর লাফাইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে শুকনা কাঠ মচকাইয়া যাইবার মত মহিষের হাড় ভাঙ্গিয়া গেল। বাঘ মহিষটাকে ধরিয়াই টান মারিয়াছিল, তারের দড়ি ছিঁড়িতে পারে নাই; হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, পরক্ষণে টর্চের সুইচ টিপিতেই তীব্র আলোকে চক্ষু দুইটি অগ্নি-গোলার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল—মাথাটা সামনেই পাইয়াছিলাম—মধ্যস্থল লক্ষ্য করিতে কিছু মাত্র অসুবিধা হয় নাই। গুলি খাইয়াই বাঘ আগের মত লাফাইয়া উঠিল, তাহার পর বার বার আছাড় খাইতে খাইতে জনের দিকে কোন কঠিন বস্তুর উপর সশব্দে পড়িয়া গেল। তাহার সহিত দীর্ঘ গোঙানি শুনিলাম। একটু সময় কাটিতে যেখানে বাঘ পড়িয়াছিল তাহার অতি নিকটে হনুমানগুলি জড় হইয়া অনবরত ডাকিয়া চলিল। সন্দেহ রহিল না বাঘের চলচ্ছক্তি রহিত হইয়াছে; না মরিয়া থাকিলেও বেশীক্ষণ আয়ু নাই।

রাত বাড়িয়া চলিয়াছে, গুমট কাটিয়া শীতল জলীয় হাওয়ার আভাস পাইতেছি। ক্রমে হাওয়ার বেগ ঝড়ের আকার ধারণ করিতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া যে দমকা আসিতেছিল তাহাতে নাগর-দোলার মত মাচানের উত্থান-পতন সুরু হইয়াছে,—গতিক সুবিধার নয়। জনকে বলিলাম তোমার বন্দুকের ট্রিগার ঠিক করিয়া রাখ। জন উত্তর দিল তাহার বন্দুক মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। আর একটি ফাঁড়া কাটিয়া গেল। পতনকালীন রেডি ট্রিগার কোন কিছুর সহিত সংঘর্ষিত হইলে টোটা ফাটিত এবং নলের মুখ আমাদের দিকে থাকিলে—বাঘের সহিত আমাদের মধ্যে কেহ শিকার হইয়া যাইত! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছি এমন সময় দূরে বায়ুর সোঁ সোঁ শব্দ শুনিলাম। বায়ু দারুণ বেগে আমাদের নিকটে চলিয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে মাচান যেন গাছের উপর মোচড় খাইতে লাগিল। কপালগুণে মাচানের ভিতরেই একটি মোটা ডাল ছিল তাহা আঁকড়াইয়া না ধরিতে পারিলে ঝাঁকুনিতে নীচে পড়িয়া যাইতাম। ঘোর অন্ধকার, অনতিদূরে আহত শার্দ্দূল, তাহার সামনে মানুষ নিরস্ত্র অবস্থায় পড়িলে ঘটনাটি কি রকম দাঁড়াইত সহজেই অনুমেয়। কিছু কাল পরে ঝড় কাটিয়া গেল—আকাশ পরিষ্কার হওয়াতে ক্ষীণ চাঁদের আলো পাইলাম।

ভোর হইতেই জন পাশের পাতা সরাইয়া ফেলিল। সুপ্রভাত, বাঘিনীর ভয়াল মূর্ত্তি অসাড় ভাবে পড়িয়া আছে, অধিকতর হিংস্রজীবকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য। নীচে নামিয়া লক্ষ্যের

স্থান পরীক্ষা করিতে আবিষ্কার করিলাম, আমার নিশানার জয়টীকা চক্ষু দুইটির ঠিক মধ্যস্থলে রক্ত রঙে রঙীন হইয়া আছে। বাঘিনীর আসিবার পথে বাচ্চার পায়ের দাগ খুঁজিলাম—পাওয়া গেল না। ফরেষ্ট আপিসে রিপোর্টের নিমিত্ত বাঘিনীর দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা মাপিলাম—লম্বায় নয় ফুট ছয় ইঞ্চি, লেজের ডগা হইতে নাকের ডগা পর্য্যন্ত; উচ্চতা তিন ফুট চার ইঞ্চি। মহিলার পক্ষে আকারটি ছোট নয়।*

গুড় ও বালি

হরবিলাসবাবু আসলে কবি; কিন্তু জন্মগত প্রেরণার দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত সরবরাহ না হওয়ায় অধুনা প্রফেসারী করিতেছেন। শিক্ষা-পদ্ধতির উৎকট শাসনতন্ত্র মানিয়া চলেন সেই কারণে মাসান্তে আয়েশোপযোগী একটি নির্দ্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সহজ জীবনযাত্রার প্রকরণে আর কিছু বলিবার নাই এমন নহে। যৎসামান্য আর্থিক সচ্ছলতার প্রকোপে কিছু দিন হইতে মানসিক চঞ্চলতা অনুভব করিতেছিলেন। অর্থাৎ ভাবাবেশের মাত্রাধিক্য ঘটিয়াছিল। প্রয়োজন না থাকিলেও হয়ত কাহাকেও মনে করিয়া মহাকবি কালিদাসের "কুমারসম্ভব" হইতে মনোহরণকারী কয়েকটি বাছা বাছা রসালো ছত্র বেপরোয়া ব্যাখ্যা করিয়া চলিতেন। ফলে ছাত্রছাত্রীসমন্বিত ক্লাসে বহু কণ্ঠের মৃদুগুঞ্জন ও অস্পষ্ট হাসি নেপথ্যে শোনা যাইত। তাঁহার রসবিশ্লেষণের আন্তরিকতা লইয়া ডেঁপো ছাত্রের দল নাকি গোপনে রসিকতাও করিয়া থাকে। যন্ত্রের যুগই আলাদা! প্রগতির প্রেরণায় রসিকের প্রাণ পর্য্যন্ত ওষ্ঠাগত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

....শ্লোকগুলির সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গমকালীন শিক্ষার্থীর নির্লিপ্ততা শিক্ষকের নিকট পীড়াদায়ক। তথাপি ছাত্র-বৃন্দের উন্নতির আশায় কাব্যের পুনরাবৃত্তি করিতেন। ইহা পরোক্ষভাবে অন্তর্দাহের

* এবারকার শিকারে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহা অস্ত্র সম্বন্ধে সতর্কতা। নিকট হইতে বাঘ ভালুক শূকর সম্বর ইত্যাদি নরম চামড়ার জন্তু মারিতে হইলে রাইফেল অপেক্ষা দোনলা বন্দুক অধিকতর সুফলদায়ী। রাইফেলের গুলি মাথায় অথবা হৃদয়ে না লাগিলে—বাঘ আঘাত পাইয়াও আক্রমণ করিতে পারে; কিন্তু lethal ballএ কখন এরূপ ঘটনা ঘটে না। দ্বিতীয়, শিক্ষিত বাঘ না হইলে মানুষের কথা, আলো, গোলমাল, কিছুই ভয় করে না এবং তাহার শিকারের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ও নাই।

কথা। কারণ তিনি এখনও দারপরিগ্রহের সুবিধা পান নাই, চিত্ত-চাঞ্চল্যে নাজেহাল হইয়া পড়িয়াছিলেন। খুবই স্বাভাবিক। বয়স বেশী হয় নাই। আমাদের ধারণা বর সাজিবার চেহারাটাও অশোভনীয় নয়। গোল বাধিয়াছিল মাথার টাক লইয়া, যাহার পরিধি বয়সের ন্যায্য সীমানার বাহিরে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। দুর্ঘনাটির জন্য মাথা অপেক্ষা কপাল অধিকতর দোষী, সুতরাং প্রতিকারের কোন পথ ছিল না। দৈবপ্রেরিত পরিবর্ত্তনকে প্রশ্রয় না দিয়া পারেন নাই। পরিবর্ত্তন যেরূপই হউক, ভবিষ্যতে একটি শুভদিনের জন্য ক্ষীণ আশাও অন্তরে জীয়াইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বিধাতা যতই কঠোর হউন না কেন, যে-যেমন তাহার জন্য ঠিক তেমনটির ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ধৈর্য্যকে ধরিয়া রাখিলেও বয়স দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছিল। ক্রমে এমন একটি সময় আসিল যখন সুন্দরী ত দূরের কথা, কোন বিরলকেশিনী কুরূপা কৃষ্ণা পর্য্যন্ত দুর্লভ হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে যৌবনের দুর্দ্দমনীয় প্রেরণা অন্তঃসলিলার মত বহিয়া চলিয়াছিল। ক্লাসে ছুটির সময় ভিড়ের মাঝে হাল-ফ্যাশানের আঁটসাট শাড়ী-পরা তন্বঙ্গী তরুণীর অঞ্চল-চঞ্চল বাতাসের কেমন করিয়া একটুকু ছোঁয়া লাগিয়া যাইতেছিল।....মনস্তাত্ত্বিকরা বুঝিবেন ঘটনাগুলি কিরূপ সংক্রামক।....

সত্য কথা গোপন করিব না। হরবিলাসবাবু প্রেমে পড়িতেছিলেন। অর্থাৎ একটি নির্দ্দিষ্ট মহিলার প্রতি আকর্ষণ ছিল। মহিলাটি মিস মৃণালিনী—তাঁহার ছাত্রী। বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আকর্ষণের প্রধান কারণ, তিনি উগ্র পাশ্চাত্যপন্থী এবং তাঁহার বেশের পারিপাট্য, যাহা ঐ আঁটসাটের পর্য্যায়ভুক্ত। তদুপরি বিলাত-ফেরত ধনীর কন্যা।

মৃণালিনীর পরিচ্ছদে যথেষ্ট সুরুচি ও শালীনতার পরিচয় থাকিলেও, তাঁহার দেহ-সৌষ্ঠবের সহিত দৃষ্টির ঘনিষ্ঠতা ঘটিলেই কল্পনা অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠে। হরবিলাসবাবু সুবিধা পাইলেই বাস্তবের সহিত কল্পনার তুলনা অলক্ষিতে সারিয়া লইতেন। এই অবসরে বলিয়া রাখা ভাল, হরবিলাসবাবু যে আবেষ্টনীতে মানুষ হইয়াছিলেন, সেই সমাজে আবালবৃদ্ধবনিতা মৃণালিনীর মত মহিলাকে "খেষ্টান" বলিয়া থাকে। তা বলুক, হরবিলাসবাবু নিজে উক্ত মত সমর্থন করেন না। তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি, অধিকন্তু নিজেকে কৃষ্টির প্রচারকও ভাবিয়া থাকেন। শিক্ষার প্রচার সম্পর্কে তাঁহার ঔদার্য্যের পরিচয় পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে।

যে সময় মৃণালিনীর সান্নিধ্য বাসনা হরবিলাসবাবুকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই সময় কয়েকটি অনুকূল ঘটনা ঘটিয়া গেল। প্রথমটি মৃণালিনী ক্লাসেই একটি কবিতার খাতা হরবিলাসবাবুর টেবিলের সামনে রাখিয়া বলিয়াছিলেন, "স্যার, আমার কবিতাগুলি যদি ছাপিয়ে দেন তা হ'লে grateful হব।"....দ্বিতীয়টি পিসীমা পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন—"পাস-করা পাত্রী

পাওয়া গিয়াছে। জানা ঘরের ডাগর ও সুলক্ষণা মেয়ে। ঠিক যেমনটি চাও তেমনিতর। শীঘ্র পত্রোত্তর পাঠাও, মেয়ে দেখাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।” তৃতীয়টিও পত্র। দামী কাগজে টাইপ-করা নিমন্ত্রণপত্র। মিস্ মৃণালিনীর পিতা চায়ে ডাকিয়াছেন। চিন্তা ঠিক দিকে গাঢ় করিতে পারিলেই অনুমান করা চলে কবিতা ও চায়ের সহিত একটা রহস্যময় যোগ আছে।....

পিসীমার পত্রোত্তর তখনকার মত স্থগিত রাখিয়া ফার্স্ট চান্স (first chance) মৃণালিনীকে দিবেন ঠিক করিয়া ফেলিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে চায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। কারণ ছিল। প্রথম তিনি সাধারণ স্ত্রীলোকের সহিত তুলনায় মৃণালিনীকে উর্দ্ধলোকবাসী মনে করিতেন। দ্বিতীয়, বাজারে পণ্যদ্রব্যের ন্যায় জীবনের সাথীকে জড় পদার্থের মত গ্রহণ করাটা নারীর এবং সমাজের অবমাননা ভাবিতেন।....

হৃষ্টচিত্তে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে কি হইবে, যে সমাজে তাঁহাকে ডাক পড়িয়াছিল, সেখানে বাঙালীর বাঙালীত্ব লজ্জাকর পরিচয়। সুতরাং মধ্যবর্ত্তী কয়েকটা দিনের ফাঁকে অবশ্যপালনীয় বিদেশী ভব্যতার অনুষ্ঠানগুলি আয়ত্তের নিমিত্ত নিজেকে নিযুক্ত করিয়া ফেলিলেন। এদিক দিয়া তাঁহার নিষ্ঠার কোনরূপ অভাব ছিল না। কিন্তু অনভ্যাসের তিলক সুখপ্রদ হইতেছিল না। গলার ফাঁস অর্থাৎ টাইয়ের গেরোর আভিজাত্য লইয়া গোল বাধিল। এ ত সাধারণ গেরো নয়, সাহেবী গেরো। কোন্ প্যাঁচ কষিলে গেরো বেমালুম অদৃশ্যভাবে নিজের অস্তিত্ব জাহির করিবে তাহার সঠিক্ হদিস্ পাইতেছিলেন না। সান্ত্বনা পাইলেন এই ভাবিয়া, একটু-আধটু গলদ থাকিয়া গেলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হইবে। যুক্তি সত্যের বর্ম্মে আবৃত হইলেও সংস্কারের চাহিদা স্বতন্ত্র ;....যাহা চল্‌তি প্রথাকে অপমান করিতে পারে না। হরবিলাসবাবু জানিতেন না যে পোষাকে স্মার্টনেস্ না থাকিলে উক্ত সামাজিক অনুষ্ঠানে ভদ্রসন্তানের জাতিচ্যুতি ত সামান্য কথা; জলজ্যান্ত মানুষটিই অনেক সময় অস্বীকৃত হইয়া বসে।

....শুধু কি আভিজাত্যসম্পন্ন গলার গেরো, ভাষা লইয়াও অসুবিধায় পড়িলেন। কোন্ ভাষায় তিনি কথা বলিবেন? মৃণালিনীর সংস্কৃত উচ্চারণ প্রশংসনীয় হইলেও বাংলায় তিনি কথা বলেন না এবং যদি বা কোন সময় অসাবধানতাবশতঃ বলিয়া ফেলেন তো তাহার শব্দধ্বনি ইচ্ছাকৃত আড়ষ্ট। এমত অবস্থায় কথোপকথন ইংরেজীতে করিতে হইবে। কিন্তু অনর্গল ইংরেজী ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে কি? ইংরেজীতে কথা বলা তো কোন কালেই সড়গড় করেন নাই। শেষ পর্য্যন্ত ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি ভাগ্যের স্কন্ধে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

....রবিবারের সকাল। হরবিলাস বাবু জাগিয়া বসিলেন। গত রজনীর সুখস্বপ্ন চলচ্ছবির

ন্যায় মনশ্চক্ষে দেখিতেছিলেন। সকালটা কাটিল ভাল।....অপরাহ্ণ পাঁচটা পনর মিনিটে পার্টিতে হাজিরি দিবার কথা। সাহেবী কায়দায় নিমন্ত্রণের পিছনে যে আদেশ ছিল তাহা সময় সম্বন্ধে হরবিলাস বাবুকে সতর্ক করিয়া দিতেছিল। তিনি প্রস্তুত হইয়াই মিনিট গুনিতেছিলেন। তখনও অর্দ্ধ ঘণ্টা বাকী। পথে নানারূপ বিঘ্নের জন্য যে সময়টুকু হাতে রাখিয়াছিলেন তাহা লইয়াই বাহির হইয়া পড়িলেন।

....পথে কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। অবশ্যম্ভাবী হিসাব করা accidentগুলি এড়াইয়া ট্রাম নিজস্ব গতিতে যথাসময়ে হরবিলাস বাবুকে গন্তব্য স্থানের অনতিদূরে পৌঁছাইয়া দিল।....এখন কি করা যায়? সোজা মৃণালিনীর বাড়ীর দিকে চলিলে প্রায় পনর মিনিট আগে গিয়া পৌঁছাইবেন। হয়ত মৃণালিনীর পিতা ভাবিবেন, প্রফেসার অসভ্য অথবা অসামান্য হ্যাংলা। গ্রীষ্মকালে পড়ন্ত রৌদ্র অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল। তদুপরি বিদেশী গরম পোষাক। দীর্ঘকাল নেপথলিনের সহিত ঘনীভূত সহবাসে প্রাণবান্ হইয়া উঠিয়াছে। ঘর্ম্মাক্ত দেহের সহিত ছোঁয়া লাগিলেই জ্বালাইয়া দিতেছে। ইতিমধ্যে টাকের চতুষ্পার্শের অবশিষ্ট কেশ হইতে ঘন পমেড তরল ভাবে ঝরিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রবহমান তরল পমেড রৌদ্রতপ্ত চিক্কন টাক হইতে যেরূপ বেগে গলিতেছিল তাহাতে ঘর্ষিত গণ্ডের হেজ্‌লীন স্নো স্থানে স্থানে তৈলাক্ত হইয়া উঠিল। কঠিন কলারের জন্য কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ইচ্ছামত মুখ ঘুরাইতে পারিতেছিলেন না। ধীরে ধীরে কখন এই অসুবিধাটুকু তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল।....পোষাকের এই অপ্রত্যাশিত সহজ অনুভূতি তাঁহাকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিল। যথাস্থান স্পর্শ করিয়া বুঝিলেন কিনারা নরম হইয়া দুম্‌ড়াইয়া গিয়াছে। আমরা দেখিলাম, শুধু দুম্‌ড়ায় নাই, প্রচুর তৈলে সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।....স্নোর স্বরূপ সাম্‌লাইবার জন্য একবারও তিনি মুখ মোছেন নাই। কিন্তু আর তো সহ্য করা যায় না। প্রায় বেপরোয়া হইয়াই পকেট হইতে আন্‌কোরা নূতন রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিলেন। নূতন শুক্‌না রুমাল ও গামছার ব্যবহারে বড় বিশেষ পার্থক্য নাই। গায়ে বসিতে চায় না। মুখ মুছিতেই আসল দেহবর্ণের উপর কৃত্রিমের আবরণ তো ফাঁস হইয়া গেলই, তাহার উপর মুখশ্রীটি দাঁড়াইল ডোরা-কাটা কাঠবেড়ালীর চামড়ার মত। হরবিলাস বাবু জানিলেন না আশার অঙ্কুর কি ভাবে তিনি স্বহস্তে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন।

....ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি বাহির হইয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের ভাবিয়া কোন লাভ নাই। কব্জি-ঘড়ি কাত করিয়া দেখিলেন—বড় কাঁটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের দিকে বেশ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পানওয়ালার দোকানের ছায়া পরিত্যাগ করিয়া মৃণালিনীর বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিলেন; স্বনামধন্য পুরুষের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে দেরী লাগিল না। স্থাপত্য লেপা-পোঁছা।

বাড়ীর কম্পাউণ্ড বহুবিস্তৃত। লন—ফুল গাছ ইত্যাদিতে পূর্ণ। হঠাৎ ঢুকিয়া পড়িতে সাহসের দরকার হয়। গেটের স্তম্ভে কালো কাঠের উপর পালিস-করা ক্ষুদ্রাকার পিত্তলের অক্ষরে মালিকের নাম—কে, ডি, গুপ্তা। স্বত্বাধিকারীর নাম সম্বন্ধে তুচ্ছ প্রমাণ করিবার প্রয়াস অক্ষরগুলিতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। নেম্‌-প্লেটের বিজ্ঞপ্তি যে প্রকারের নম্রতাই আঁক্‌ড়াইয়া থাকুক না কেন, অর্থশালী দেশী সাহেবের ভৃত্যরা যে চড়া মেজাজের হইয়া থাকে তাহা হরবিলাস বাবু জানিতেন। প্রফেসারী গ্রহণের পূর্ব্বে যখন তিনি চাকরির চেষ্টায় ঘুরিতেছিলেন সেই সময় অভিজ্ঞতাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

হরবিলাস বাবু বিনীত ভাষায় দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহাই কি গুপ্ত সাহেবের বাড়ী ?

হরবিলাস বাবুর মুখশ্রী অথবা তাঁহার অশ্চর্য্যজনক প্রশ্ন শুনিয়াই হউক, দারোয়ান অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"....সে হরবিলাস বাবুকে বেয়াকুবই ভাবিয়াছিল। তাহা না হইলে এ অঞ্চলে বাড়ীটি গুপ্তসাহেবের কি না কেহ প্রশ্ন করিতে পারে ? প্রথমবারেই উত্তর পাইয়া হরবিলাস বাবু উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বলিলেন—"আমি নিমন্ত্রিত। সাহেবের এখানে চায়ের পার্টি আছে। ভেতরে যাবার পথ দেখিয়ে দাও।"

দারোয়ান পুনরায় হরবিলাস বাবুর আপাদমস্তক চোখ বুলাইয়া লইল। তাহার পর প্রভুর আদেশানুসারে অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটি সেলাম ঠুকিয়া পথপ্রদর্শক হিসাবে সামনে চলিতে লাগিল।

ভিতরে লাল সুরকির রাস্তা। বাড়ীর দরজার সামনে গাড়ী-বারান্দা। স্তম্ভ নাই—খিলান নাই, গাড়ী-বারান্দার ছাদ ঝুলিতেছে। হরবিলাসবাবু স্থানটি দ্রুত অতিক্রম করিয়া ড্রইং-রুমে বসিতে পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।....অল্পক্ষণের ভিতরেই মৃণালিনী ঘরে আসিলেন এবং হরবিলাস বাবুর পাশে সোফায় অতি নিকটে বসিলেন। কনুইটা সোফার গদি পার হইয়া প্রায় একটুকু ছোঁয়া লাগার নাগালে আসিয়া পড়িয়াছে। সুযোগ-মাফিক একটু নড়িয়া বসিতে পারিলেই....।....হরবিলাস বাবু দ্বিগুন ভাবে ঘামিতে লাগিলেন। সমর্থনের যোগাযোগে একটু ছোঁয়া যে কতটা মর্ম্মস্পর্শী, তাহা হরবিলাস বাবুর আসনে না বসিলে উপলব্ধি অসম্ভব।

....মৃণালিনীর চলা ফেরা, কথা বলা এবং প্রসাধন আজ চিত্তাকর্ষণের চরম সফলতা লাভ করিয়াছে। চকিতে অস্বাভাবিক রকমের সূক্ষ্ম ভ্রূ নাচিয়া উঠিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে শাড়ী সংযত করিতেছেন এবং থাকিয়া থাকিয়া জটিল হাসির দ্বারা গণ্ডে লোভনীয় টোল ফেলিতেছেন। উহা যেন সাধনার দ্বারা আয়ত্ত করা হইয়াছে। প্রসারিত কনুইটা বুঝি-বা এক বার হরবিলাস বাবুর গায়ে ঠেকিয়াই গেল।

....এমনি সময় একে একে অন্য নিমন্ত্রিতরা আসিতে লাগিলেন। পরিচয়ের পালা শেষ

হইলে চা আসিল এবং তৎসহিত গৃহকর্ত্তাও ঘরে ঢুকিলেন। অতিকায় মানুষ, কুটিল চাহনি এবং মনোভাব কতকটা—আমিই সব; সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় আমারই উপর নির্ভর করিতেছে; আমার অবাধ্য হইও না। যথাযথভাবে নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করিয়া তিনি হরবিলাস বাবুর পার্শ্বে বসিলেন। নিকটেই সোফায় মৃণালিনীর অপর পার্শ্বে একটি অস্বস্তিকর কাণ্ড ঘটিয়া গেল।···· মৃণালিনী এখন আর একেলা নাই। একটি টেঁসী রঙের ছোক্‌রা অবিচলিত চিত্তে নীতি-শাস্ত্রের সব আইন অগ্রাহ্য করিয়া একেবারে গা ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। পরশ্রীকাতরতা নয়····হরবিলাস বাবু ভিন্ন জাতীয় অন্তর্দাহে জ্বলিতে লাগিলেন।

মিঃ গুপ্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই সূত্রে সারিয়া লই। তিনি অতি সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের সন্তান! বাল্য ও কৈশোর দারুণ অসচ্ছলতার ভিতর দিয়া কাটিয়াছিল। অভাব তাঁহাদের সংসারকে এমন ভাবেই ঘিরিয়া ধরিয়াছিল যে আর্থিক অনটনবশতঃ শিশুপাঠ্য কয়েকটি পুস্তক পড়িয়াই ছাত্রজীবনের ইতি করিতে হইয়াছিল। তবে ধারাপাতে তিনি অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং গোপনে অঙ্ক কষিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেন। গোপনে বলিলাম, কারণ অসুস্থ পিতা এই বিলাসিতার খবরটি জানিলে হয়ত দুঃখিত হইতেন। তাঁহার একটি ছোট মণিহারীর দোকান ছিল। এই দোকানই সংসার চালাইবার একটি মাত্র অবলম্বন। দোকান চালানর ভার পড়িয়াছিল বালক পুত্রের উপর।····দোকানের কর্ত্তব্যগুলি করিয়া নিজের সখ মিটাইতে হইলে সময়টা গোপনেই ব্যবহার করিতে হইত।

····তখনকার দিনে গ্রামে চিকিৎসক সহজলভ্য ছিল না। মাদুলী-টোট্‌কা ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়াই লোকে রোগ সারাইত অথবা মরিত। গুপ্ত সাহেরের পিতার রোগ সারিল না। পুত্রের উপর দোকানের ভার দিয়া হঠাৎ এক দিন তিনি মারা গেলেন। তাহার পর হইতে গুপ্ত দোকান চালাইয়া আসিতেছেন। তিনি ব্যবসায়ীর বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শুধু অন্নসংস্থানের জন্য তিনি কারবার করিতেন না—ব্যবসা তিনি ভালবাসিতেন। শহর হইতে মাল খরিদ করিবার সময় কতবার ভাবিয়াছেন কবে তাঁহার ছোট দোকানটি শহরের শেঠজীর কারবারের মত বাড়িয়া উঠিবে। অধ্যবসায়ে একনিষ্ঠা তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা পূর্ণ করিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার ব্যবসা ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে এমন একটি সময় আসিল, যখন তিনি যাবতীয় বস্তুর কারবারী হইয়া উঠিলেন এবং ব্যবসার খাতিরে ঘন ঘন বিলাত পর্য্যন্ত পাড়ি দিতে হইল।

····এই ভাবে দীর্ঘকাল সাহেবদের সহিত ঘনিষ্ঠতায় ইংরেজীতে কথা বলা তাঁহার নিকট সহজ হইয়া আসিয়াছিল। সূত্রটির প্রভাব পরশ্-পাথরের মত। বিলাতী ভাষার ব্যবহার ও সামাজিক ভদ্রতার আদান-প্রদানে কখন তিনি সাহেব হইয়া গিয়াছিলেন তাহা নিজেই জানিতে পারেন নাই।

…কর্তা সাহেব হইলেও গৃহকর্ত্রী হিন্দুধর্ম্মের সনাতন অনুষ্ঠানগুলি ছাড়েন নাই। তাঁহার জীবিতাবস্থায় গুপ্ত সাহেবকে আফিসের কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল সিঞ্চনে দেহ মন পবিত্র করিয়া অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার পাইতে হইত। গৃহকর্ত্রী দুইটি কন্যা রাখিয়া দীর্ঘকাল গত হইয়াছেন।

গুপ্ত সাহেবের প্রতি মা-সরস্বতীর ব্যক্তিগত ভাবে আক্রোশ থাকায় অবিচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি দৃঢ়পরিকর হইয়াছিলেন। আধুনিক ধরণে কন্যা দুইটির উচ্চশিক্ষা তাহার প্রমাণ। প্রথমার পরিচয় প্রথমেই দিয়াছি। দ্বিতীয়া বিলাতে কি একটা বিশেষ রকমের শিক্ষার জন্য গিয়াছেন। মৃণালিনীর বাংলা উচ্চারণের নব সংস্করণ পিতার নিকট শিক্ষা, কম বয়সেই অভ্যাসটি আয়ত্ত হইয়া গিয়াছিল। পিতা বাধ্য হইয়াই বাংলা শব্দের বিকৃত উচ্চারণ করিতেন। কারণ ছিল। উক্ত প্রথা অবলম্বন না করিলে গুপ্ত সাহেবের অনেক সময় প্রাদেশিক টান আসিয়া পড়িত, যাহা তিনি পছন্দ করিতেন না। অখ্যাত পল্লীগ্রামে তাঁহার জন্মস্থান, ইহা প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে তাঁহার বাধিত। সেই কারণে সাহেবী টান দিয়া বাংলা কথা বলিতেন যাহা শেষ পর্য্যন্ত স্বভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

(ইহার পর কথোপকথন সহজ বাংলায় লিখিত হইলেও পাঠক সুবিধা ও ক্ষমতানুসারে গুপ্ত সাহেবের বাংলায় বক্তব্যগুলি আড়ষ্ট করিয়া লইবেন। মৃণালিনী সম্বন্ধেও ঐ একই অনুরোধ)

গুপ্ত সাহেব রাশভারী গলায় প্রস্তাব করিলেন, "দেখুন, আমার মৃণালিনীকে কবিতা লেখার লেসন (lesson) নিতে বলি। শুনেছি আপনি কবি, and you know your business well. যাতে কম সময়ের ভেতর শিখতে পারেন' তার ব্যবস্থা করতে হবে….I am sure you have a formula for a short cut.

হরবিলাস বাবু উত্তর করিলেন কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ ও ভাষার মাধুর্য্য বোঝান চলে, কিন্তু মানুষকে ফরমাস-মত ভাবুক করা যাইতে পারে, এরূপ ধারণা তাঁহার নাই।

…Negative উত্তরটা গুপ্ত সাহেবের ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন, "কেন, আমরা তো বিজ্ঞাপন লেখবার জন্য কবি এবং সাহিত্যিকদের engage করে থাকি। যেমনটি চাই তেমনটি হয়। আমাদের অনেক বিজ্ঞাপন কবিতাতে আছে।"

হরবিলাস বাবু বলিলেন, "আপনি কি আদেশ ক'রে যে-কোন মানুষকে সব রকম মানসিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করাতে পারেন? হাসি, কান্না, রাগ, দুঃখ এগুলো যে কারণ-সংযুক্ত সাময়িক উচ্ছ্বাস। ব্যক্তিগত ভাবে অন্তরের কথা।"

গুপ্ত সাহেব বুঝিলেন প্রফেসর হয় ত ভাবিতেছেন বিনা খরচায়, কন্যার শিক্ষা সারিয়া লইতে চাহেন সেই কারণে প্রফেসার proposal-টা এড়াইয়া চলিতেছেন।

গুপ্ত সাহেব দুই হস্তের মেদপূর্ণ স্ফীত আঙুলগুলি একত্র করিয়া চেয়ারের পৃষ্ঠদেশে হেলান দিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, এটা definitely business proposal, you see, আমি সব দিক দিয়ে মৃণালিনীকে accomplished ক'রে তুলতে চাই। Oh, she is a gem !"

অনতিকাল পূর্ব্বে gem সম্বন্ধে হরবিলাস বাবুরও মতদ্বৈধ ছিল না। কিন্তু ঐ লোকটা অমন করিয়া মৃণালিনীর পাশে গা ঘেঁসিয়া বসাতে দো-মনা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তদুপরি ভাব অভিব্যক্তির short-cut formula কিরূপ হইতে পারে তিনি জানিতেন না। কবি-খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও হরবিলাসবাবু বিনা দ্বিধায় স্বীকার করিলেন নূতন আবিষ্কৃতি সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। গুপ্ত সাহেবের ব্যবসায় বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ। সহজ বাংলায় যাহাকে বলে—তিনি একটি ঝানু। কন্যাকে কবি বানাইবার transaction পাকা করিবার জন্যই হরবিলাস বাবুকে ডাকা। এক কথায় অজ্ঞতা স্বীকার করায় গুপ্ত সাহেব ভাবিলেন উহা দর বাড়াইবার একটি প্যাঁচ। ভিন্ন ভাবে দেখিলে তাঁহার মতে দাঁড়ায়, 'fishing for compliments'.

নম্রতার আড়ালে আত্মস্তুতির যাচ্ঞা কোন্ সময় কাহারা করিয়া থাকে গুপ্ত সাহেবের তাহা জানা আছে। একটি মোটা 'হুঁ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "I see, you have a trade secret ! ধরুন, আমি যদি বলি highest bid-এ আপনার ফরমূলা কিনে নেবো ?

হরবিলাস বাবু ফাঁপরে পড়িলেন। এক দিকে অবোধ্য প্রশ্নমালা, অপর দিকে দৃষ্টিকটু আচরণ। মৃণালিনীর সোফায় এখন কি হইতেছে কে জানে ! হঠাৎ মুখ ঘুরাইয়া দেখিয়া লইবারও উপায় নাই। গুপ্ত সাহেবের নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন চায়ের নিমন্ত্রণ একটা অছিলা মাত্র। নিরিবিলিতে কন্যার সহিত আলাপ করাইয়া দেওয়াই আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু ঘটিল ভদ্রাচারের অত্যাচার।....হরবিলাস বাবুর বিমর্ষ ভাব লক্ষ্য করিয়া গুপ্ত সাহেব বলিলেন', "দেখুন, আমাদেরও trade secret আছে। কিন্তু reliable party ও ভাল offer পেলে আমরা অনেক সময় consider করে থাকি। যদি আমার মৃণালিনীকে কবি ক'রে দিতে পারেন, of course, of the highest order, তা হ'লে আপনার terms accommodate করবার চেষ্টা করব। I quite realise সস্তায় আপনি ফরমূলা ছাড়তে রাজী নন। Now, come with your quotation. But mind, specific time-এর ভেতর contract fulfil করতে হবে। Business is business." আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, চায়ের পার্টিতে মনোভাব খাপ খাইবে না ভাবিয়া উত্তেজক বাক্যটি অব্যক্ত রাখিয়া দিলেন। পরক্ষণেই বলিলেন—"Wait a minute, কাজটা এখুনি সেরে ফেলা ভাল। After all, it is not a complicated calculation."

এতটা বলিয়া হরবিলাস বাবুর মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই বেয়ারাকে পেনসিল কাগজ

আনিতে আদেশ করিলেন। হরবিলাস বাবু বুঝিলেন ঘটনাচক্র complications-এর দিকেই গড়াইতেছে। ইতিমধ্যে cream roll-এর রসাস্বাদ গ্রহণ করিতে গিয়া অভ্যন্তরস্থিত গলিত খাদ্য হঠাৎ বাহির হইয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে আঙুলগুলি ফাটা বেগুনীর আকার ধারণ করিল। হরবিলাসবাবু সতর্কতা অবলম্বন করিয়াই আহার্য্য বস্তুগুলি গ্রহণ করিতেছিলেন। ক্রীম রোল যে টিপিলে ফাটিয়া যাইবে তাহা তাঁহার জানা ছিল না। দৃশ্যটি প্রাচীনপন্থী হরবিলাস বাবুকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। হাত ধুইবার কোন ব্যবস্থা সামনে না থাকায় যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত হাতটি পকেটে প্রবেশ করাইয়া অলক্ষিতে গুপ্তস্থানে রুমালে হাত ঘষ্টাইয়া উহা presentable করিয়া বাহিরে আনিলেন।

ঘটনাটি অপর কেহ দেখিয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, তবে গুপ্ত সাহেবের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তিনি পেষ্ট্রীর (pastry) প্লেটটি পুনরায় হরবিলাস বাবুর সামনে নিজেই তুলিয়া ধরিলেন, ব্যাপারটি লঘু করিবার জন্য নয়, শীঘ্র transaction-এর সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন বোধ করিতেছিলেন। ক্ষুধাগ্নি জ্বলিতেছিল। হরবিলাস বাবুর লোলুপ দৃষ্টিকে অপরিচিত ভক্ষণীয়ের বহিরাকৃতি আকর্ষণ করিলেও খাদ্যগ্রহণে বিরত হইলেন। ভাবিলেন কাজ নাই বাপু ওদিকে লোভ দিয়া, কি খাইতে গিয়া আবার কি বাহির হইয়া আসিবে। সঙ্কেতে জানাইয়া দিলেন উদরপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, আর স্থান নাই।

সঙ্কেতটিতে অবিমিশ্র স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গী উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, যাহা মার্জ্জিত সমাজে অভদ্রোচিত আচরণ ভাবা নিয়ম হইয়া গিয়াছে। Lady-দের সামনে এত বড় দুঃসাহসিকতা গুপ্ত সাহেব কেন সহ্য করিয়াছিলেন আমরা জানি। Business সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্কল্প দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি পুনরায় কবিতার কথা পাড়িলেন এবং পরম সুহৃদের মত হিতোপদেশ দিলেন এই বলিয়া, "Contract সই করলে আপনারই সুবিধে হ'ত। আপনি নিজের interest-এ এই কাজটি শীগ্‌গির সেরে ফেলতেন, আমিও record রাখবার সুবিধে পেতুম।"

কবি হরবিলাসের অন্তরে নিরীহ প্রাণ 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়িতেছিল। দুর্ভোগ কপালে থাকিলে কে রক্ষা করিবে? গত রজনীর সুখস্বপ্ন অভিসম্পাতে পরিণত হইয়াছে। আলাপের সূত্রপাতেই ভাবের ফরমুলার প্রবর্ত্তন, পরে কবিতার মেশিন—সর্ব্বোপরি কবি-সৃষ্টির business proposal!....হরবিলাস বাবু হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন। চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অবশেষে কবিতাও মেশিন দ্বারা প্রস্তুত হইবে না কি? যখন তিনি ভবিষ্যতের কাব্য industry-র কথা ভাবিতেছিলেন তখন তাঁহার vested interest-এর কথা নিশ্চয় মনে উঠিয়াছিল। তবে কি অদূর ভবিষ্যতে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার কবিখ্যাতি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে? কবি ও তাঁহার কবিতা

capitalist-এর ব্যবসার মূলধন হইয়া দাঁড়াইবে? অথবা রাজনীতির ক্রমপরিবর্ত্তনে কবি State-এর property হইয়া যাইবে? এখনই চিত্রসমালোচকেরা ছবিকে জনপ্রিয় করাইবার জন্য আন্দোলন তুলিয়াছেন, যাহা mass production-এর ভিন্ন রূপ।....হরবিলাসবাবু তাঁহার vested interest অথবা কবিখ্যাতির জন্মগত দাবী সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

হরবিলাসবাবুকে অন্যমনস্ক দেখিয়া গুপ্ত-সাহেব তাঁহার বক্তব্য সহজ করিবার জন্য কতকগুলি সঙ্গত যুক্তির অশ্রয় লইলেন। বলিলেন, "Look here, my dear young man, আপনি নিশ্চয় জানেন না যে, আমাদের আপিসে বড় বড় অঙ্ক পর্য্যন্ত মেশিনে কষা হয়ে থাকে। অতএব সামান্য কবিতার ভাব এবং তার কয়েকটা কথা কেন যে মেশিন তৈরি করতে পারবে না, আমি বুঝতে পারি না। দেশের দুরবস্থা দেখে আমার দুঃখ হয়।....That time is money—আমরা কবে বুঝতে শিখবো বলতে পারেন? আপনাদের thinking takes too long a time for a single কবিতা। আর, finished production হ'লেও, that is done in a very crude and laborious way. কাটাকাটি....ছাঁটাছাঁটি....Gosh—sickening! It is simply waste of time and energy"....

হরবিলাসবাবু অকাট্য যুক্তির গোঁত্তা খাইয়া শুধু ফাঁপরে পড়েন নাই, কথাটা সত্য বলিয়াই উপলব্ধি করিতেছিলেন। তর্কের ফাঁক নাই, স্বীকার করিলেন কবিতা লেখা সময়ের অপব্যবহারই বটে। যুক্তি কাজে লাগিতেছে দেখিয়া গুপ্ত-সাহেব উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন; বলিলেন, "That's exactly what I don't want",....উত্তেজনাটিও কার্য্যসিদ্ধির একটি ভিন্ন প্রকারের প্রযোজনা। কখন রোষমিশ্রিত হুঙ্কার, কখন করুণার প্রার্থনা, কখন নিঃস্বার্থ সুহৃদের হিতোপদেশ ইত্যাদি—স্থান, কাল, পাত্রহিসাবে উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করিতে না পারিলে successful business man হওয়া চলে না। গুপ্ত-সাহেবের অভিজ্ঞতায় কোন ফাঁকি ছিল না। জা'ত ব্যবসায়ীর নিকট তাঁহার শিক্ষা। তা'ছাড়া স্বার্থসিদ্ধির প্রকরণগুলি তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতার মতই অবলীলাক্রমে প্রকাশ করিতে পারিতেন এবং কাজ হাঁসিল করিয়া ছাড়িতেন। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটিল।....

মৃণালিনী পিতার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া হরবিলাসবাবুর দিকে হেলিয়া পড়িলেন। একটুকু নয়, যথেষ্ট ছোঁয়া লাগিয়া গেল। ছোঁয়ার প্রতিক্রিয়া অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন কি না জানিবার উপায় ছিল না; কারণ তিনি অবিচলিত চিত্তে ভিতরের ঘটনা বেমালুম চাপা দিয়াছিলেন। শক্তিমান্ পুরুষের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে এইরূপই হইয়া থাকে। মৃণালিনী আধ আধ জড়িত ভাষায় হরবিলাসবাবুকে উত্তেজনার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

হরবিলাসবাবু বলিলেন, "আপনার বাবা কবিতার Industry-সম্বন্ধে প্রস্তাব করছিলেন।"

উত্তেজনার কারণ অবগত হইয়া মৃণালিনী শাস্ত্রসম্মত ইঙ্গিত দ্বারা পিতাকে জানাইয়া দিলেন business poposal-টি জুৎসই হয় নাই। তাহার পরই বলিলেন, "There is no hurry about it, daddy."

গুপ্ত-সাহেব অযথা বিলম্বের কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "But, my dear—তুমি এখন engaged। বিয়ের আগে accomplishment-গুলো সেরে নেওয়া আমার মতে advisable হবে।"

(১) হরবিলাসবাবু ভাবিতেছিলেন—কবিতার Industry-র কথা।
(২) গুপ্ত-সাহেব বুঝিতে পারিলেন না—কবিতার পরিকল্পনা কেন মেশিনে তৈয়ারী হইবেনা।

কন্যার শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ব্যবসায়ী নিজে calculation করিতেছিলেন। কারণ মৃণালিনী এখনও তাঁহার মতে raw material. Finished production-এ না আসা পর্য্যন্ত দাম খতাইবার উপায় নাই। বিবাহ না হইলে খরচের শেষ নাই। Accomplishment-এর ফর্দ্দ দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। পাস করা, গান গাওয়া—চুলোয় যাক্ ;....সপ্তাহান্তে একবার বিলাতী পরামাণিক দ্বারা কর্ত্তিত চুলে ঢেউ-খেলান, ফুটবল ম্যাচ দেখা ইত্যাদিও accomplishment-এর অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার মৃণালিনী চুল ছাঁটে নাই, কিন্তু দ্বিতীয়ার নাপিতের bill বিলাত হইতে আসিতেছে।....আপিসের কাজ ফেলিয়া কন্যাসহ লীগের ম্যাচ দেখিতে ছুটিতে হয়। লীগেরও কি ছাই অন্ত আছে?....ঘরে বসিয়া আরাম করিয়া খবরের কাগজে সংবাদটি জানিয়া লইলে চুকিয়া যায়, তা নয় রৌদ্রে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া....। ....ভাবিতে ভাবিতে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। বিরক্তি কবির উপর আসিয়া পড়িল। অবশেষে বোকার শ্রেণীভুক্ত কবিকে অনুকরণ! বোকা না হইলে অকারণ খাটিয়া মরে! খাটুনির return ত শেষ পর্য্যন্ত বাজে আনন্দ। শূন্য ধরিয়া ঝুলিয়া পড়া কোন্ দেশী আনন্দ তাহা ব্যবসায়ীর মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করিতে পারিল না।

যাহা হউক গুপ্ত-সাহেব নিশ্চিত বুঝিলেন, হরবিলাসবাবু যখন স্বীকার করিয়াছেন, কবিতা লেখা সময়ের অপব্যবহার, তখন তাঁহাকে বাগ মানাইয়া quotation কমাইতে সময় লাগিবে না। ইতিমধ্যে বেহারা কাগজ-পেন্সিল লইয়া উপস্থিত হইল। বেহারাকে কাগজ পেন্সিল সহ পিতার নিকট দাঁড়াইতে দেখিয়া মৃণালিনী পিতাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গুপ্ত-সাহেব উত্তর করিলেন, "ভাবের দাম calculation-এর জন্য।"

মৃণালিনী আবদারী সুরে বলিলেন, "Oh daddy—you are talking shop! Please.... no business now!"

অগত্যা গুপ্ত-সাহেব চুপ করিয়া গেলেন এবং অনবরত চেয়ারের হাতলে টোকা মারিয়া চলিলেন। টোকার অঙ্গুলী-নৃত্যে অসহিষ্ণুতা উৎকটভাবে ঘোষিত হইলেও হরবিলাসবাবুর সেদিকে নজর ছিল না। 'Engaged' কথাটি তাঁহার মস্তিষ্কে ঘূর্ণ্যমান অবস্থায় চরিতেছিল যাহার প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—engaged!....তবে সবই ফাঁকি! সেই অর্থপূর্ণ চাহনি, সেই কচি ও মিহি সুরে কথা, সবই ভ্যাজাল, কেবল কবিতা ছাপাইবার ঘুষ। হরবিলাসবাবু গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

চায়ের পার্টি শেষ হইতেই ক্ষুব্ধ ও ক্ষুধার্ত্ত হরবিলাস কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বাসায় আসিয়া উঠিলেন। আজ প্রয়োজন না থাকিলেও বৈকালিক চায়ের জন্য পাচক অভ্যাস-মত

ফুলকা লুচি ও গরম হালুয়া যথাসময়ে তৈয়ারী করিয়াছিল। এখন লুচি চ্যাপ্টা মারিয়া গিয়াছে, হালুয়া ঠাণ্ডা হইয়া জমাট বাঁধিয়াছে। অন্য সময় হইলে হরবিলাসবাবু হয়ত রাগিয়া যাইতেন। কিন্তু ক্ষুধাগ্নির তীব্র জ্বালায় ভক্ষণীয়ের সুস্বাদের কথা ভুলিয়াছিলেন। খাদ্যগুলি উদরস্থ হওয়ায় অনেকটা ধাতস্থ হইলেন। তাহার পর হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া চিঠি লিখিতে বসিলেন।

পত্রটি পিসিমাকে লিখিতেছিলেন। চিঠির সারমর্ম্ম বিবাহে সর্ত্তহীন সম্মতি, পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থে সামান্য আঁচ দিতেছি—"তোমরা যাঁহাকে পছন্দ করিয়া দিবে আমি তাঁহাকেই....।" স্বীকার করি, লেখার ভঙ্গীটি desperate ধরণের হইয়াছিল। আরও অনেক কথা লিখিয়াছিলেন, যাহা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছি। আমরা ত জানি হৃদয়ে কতটা আঘাত পাইয়া প্রেমাবেগ ভিন্ন মুখে ধাবিত হইয়াছিল। এইটুকু বলিতে পারি, বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক কিছুই confess করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তথাপি চিঠির ফল অশুভ হয় নাই।

লোকটা পাগল, কঙ্কালসার শীর্ণ দেহ, চক্ষু কোটরগত, দৃষ্টি তাহার সদাই স্থির ও অর্থহীন। পাগলের পায়ে মজবুত লোহার বেড়ি ও শিকল, স্তম্ভের সহিত তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। লোকটা বিষাদের জীবন্ত ছবি, তথাপি সে হাসে। সে হাসি রহস্যময়।

বাঁধনের পীড়া অসহ্য হইলে, সে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগে শিকলটা ধরিয়া টানাটানি করিয়া থাকে—লোহার শিকল ছেঁড়ে না, ব্যর্থ হইয়া পাগল শূন্যে তাকাইয়া থাকে। তাহার পরই একটি ক্রূর হাসি তাহার বিষাদময় মুখের উপর খেলিয়া যায়। পাগল কি ভাবিয়া বন্ধন মানিয়া লয়। পরে মাথাটা নীচু করিয়া বিড়বিড় করিয়া বকিতে থাকে।

আপনার বলিতে পাগলের কেহ নাই। তাহার একমাত্র দরদী রাস্তার একটি ঘেয়ো কুকুর। প্রত্যহ একটি নির্দ্দিষ্ট সময় পাগলের নিকটে সে আসে। পাগল নিজের আহারের অংশ হইতে তাহাকে খাইতে দেয়। আহারান্তে কুকুরটা পাগলের গা' ঘেঁসিয়া শুইয়া পড়ে, লেজ নাড়িয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সময় অপরাহ্নের দিকে অগ্রসর হইলে সে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। দরজা খুলিলেই গৃহস্থ-বাড়ির শুচিবাদীরা তাহাকে মারিতে আসিবে—ইহা নিত্য ঘটনা, তথাপি তাড়া

খাইবার আগের মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত পাগলকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার মন চায় না। সত্যই যখন লোকে 'দুর দুর' করিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসে, তখন সে করুণভাবে পাগলকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়ে, লেজ গুটাইয়া কোন অজ্ঞাত স্থানে চলিয়া যায়। পুনরায় গভীর রাত্রে ফিরিয়া আসে, পাগলের কাঁথার উপর নিশ্চিন্তমনে ঘুমায়—পাগল বসিয়া থাকে।

পাগল চিররুগ্ন। অতীতের কথা, কোন এক সময় তাহার কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যানুরাগ এমন একটি চারিত্রিক ও অধ্যবসায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, যাহা সাধারণের পক্ষে অননুকরণীয়। ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া অত্যধিক অধ্যয়ন ও তৎসহিত আদর্শ-চরিত্র গঠনের অস্বাভাবিক চেষ্টায় যে প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছিল, তাহারই ফলে আজ সে বিকৃতমস্তিষ্ক, মানুষের সমাজে পরিত্যক্ত।

পাগল ঘর ছাড়িয়াছে বহুদিন। সে আপন খেয়ালেই ঘুরিতেছিল, কিন্তু দূরসম্পর্কীয় কোন আত্মীয়ের কৃপায় পুনরায় মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। কৃপার সহিত বৈষয়িক স্বার্থ জড়িত ছিল, সেই কারণে আত্মীয় পাগলকে অতি আপনার করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। পাগল পোষায় কোন হাঙ্গামা ছিল না। বাড়ির সকলের উচ্ছিষ্টান্ন একত্র সংগৃহীত হইলেই সে পরম পরিতোষের সহিত ভক্ষণ করিত, আস্বাদ অথবা পরিমাণ সম্বন্ধে কখনই তাহাকে অভিযোগ করিতে শুনা যায় নাই।

সেদিন ভোর হইতেই মুষলধারায় বৃষ্টি নামিয়াছিল। খোলা বারান্দায় বৃষ্টির ছাটে পাগল ভিজিয়া চপ্‌চপে হইয়া গিয়াছে। মাঘের শেষে বৃষ্টি, শীতে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে, তথাপি শীত নিবারণার্থে আত্মীয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত কাঁথাটি গায়ে দেয় নাই। সেটা আতুপাতু করিয়া দেয়ালের একটি কোণে তুলিয়া রাখিয়াছে এবং নিজের দেহের আড়াল দিয়া কাঁথাটিকে জলের ছাট হইতে আগলাইতেছে। উদ্দেশ্য তাহার বন্ধু আসিয়া ওই কাঁথায় শুইবে।

মাঝে বৃষ্টির সামান্য উপশমের সুবিধা পাইয়া কর্ত্তাবাবু সেই কখন আপিসে চলিয়া গিয়াছেন। পাগল ভাবিতেছে, বেলা বোধ হয় অনেক হইয়া থাকিবে। কর্ত্তাবাবুর পোষাক-পরা গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়াই পাগল সময় ঠিক করিয়া থাকে। পাগলেরও সময় নির্দ্ধারণের প্রয়োজন হয়, কারণ কর্ত্তাবাবু পোষাক পরিয়া বাহির হইয়া গেলে একটি নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হইবার পর তাহার বন্ধুর আসিবার সময় সন্নিকট হইতে থাকে। আজ সেই সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বন্ধু আসে নাই; পাগল অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। বন্ধু ছাড়া আর একজনের অনুপস্থিতি পাগল অনুভব করিতেছিল—সে বাড়ির বুড়ী ঝি। বৃষ্টির অজুহাতে কামাই করিয়াছে, সেই কারণে পাগলও আহার পায় নাই। রোজ থালাভর্ত্তি ভাত বাসায় লইয়া যাইবার সময় সে পাতা-কুড়ানো খাদ্য দূর হইতে পাগলের নিকট ফেলিয়া দিত। আজ এঁটো কুড়াইবার লোক নাই, তদুপরি স্বহস্তে এঁটো

তোলার প্রতিবাদে বাড়ির মেয়েদের ভিতর একপ্রস্থ কলহ হইয়া গিয়াছে, পরে গত্যন্তর না থাকায় যে যাহার পাতা তুলিয়া নিজেরাই উঠানে ফেলিয়া দিয়াছে। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের মেয়েরা তো রাস্তার ডাস্ট্‌বিনের নিকট যাইতে পারে না। বারান্দাতে বা'র হওয়া অসম্ভব, পাগল—লোক ভাল নয়। সকলে ভাবিয়াছিল—পাগল বই তো নয়, একদিন না খাইলে আর কি হয়? কিন্তু পাগলেরও ক্ষুধা পায়, যাহার তাড়নায় সে তখন বন্ধুর কথাও ভুলিয়াছিল। জঠরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে কি হইবে, সে কখনও কাহারও নিকট দান চাহিয়া লয় নাই। শূন্য উদর মোচড় দিয়া উঠিতে শিকলটাকে ধরিয়া টান মারিল। লৌহশিকল সিমেণ্টের মেঝেতে আছাড় খাইয়া ঝনঝন করিয়া উঠিল। পাগলের অত্যুগ্র উচ্ছ্বাসগুলি শিকলটানার মধ্য দিয়াই প্রকাশ হইয়া থাকে। শিকলের উত্থান-পতনে যে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়, তাহাতে পাগল কি শোনে এবং বোঝে সেই জানে।

বার দুই তিন ভারী লোহা টানাটানি করিয়া পাগল ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। পাগল যে কেন শিকল ছিঁড়িবার চেষ্টা করে, তাহা লোকে বোঝে না, তাহারা বলে—এমন দয়ালু আত্মীয় না পাইলে বেচারা অনাহারে অথবা বেঘোরে কোথাও মার খাইয়া মরিত। একে মাথার ঠিক নাই, তাহার উপর নজরটা কেমনতর—সোমত্ত বয়সের বউ-ঝিদের একবার দেখিলে হয়, ওর চোখ দুইটা তখন জ্বলিতে থাকে ক্ষুধার্ত্ত বাঘের দৃষ্টির মত—দর্শক ও দৃশ্যে যেন খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ।

বৈকাল হইয়া গিয়াছে, পাগলের ক্ষুধায় এখন তীব্র জ্বালা নাই। কুকুরটাও আসে নাই। বৃষ্টি তখনও টিপটিপ করিয়া পড়িতেছে। পাগলের আজ কি হইয়াছে, কে জানে? সে থাকিয়া থাকিয়া নিজেকে দেয়ালের উপর এলাইয়া দিতেছে। পুরাতন বাড়ির নোনাধরা বালি-খসা ইঁট হইতে টসটস করিয়া ফোঁটার পর ফোঁটা জল বরফ গলার মত পাগলের কাঁধ হইতে ঝরিয়া বুক পর্য্যন্ত ভিজাইয়া দিতেছে, তথাপি সে কাঁথাটা ব্যবহার করে নাই। কিছুকাল পরে বুড়ী ঝিয়ের বদলি তাহার মেয়ে বাবুর বাড়িতে কাজে আসিল। নূতন ঝি সবে ফুটপাথ হইতে বারান্দার সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়াছে, এমন সময় পাগল শিকলটা প্রাণপণ শক্তিতে টানিয়া ঝিয়ের প্রায় নাগালে আসিয়া পড়িল, কিন্তু দেহ স্পর্শ করিতে পারিল না; কারণ শিকলের শেষ বিস্তৃতি ওইটুকু। অকস্মাৎ পাগলের এই আচরণে ঝি ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বৃষ্টির উপশমে রাস্তায় দুই-একটি করিয়া পথিকের আবির্ভাব হইতেছিল। কপালগুণে ঝি একটি বাবু-ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল। ভদ্রলোক 'কারণে'র প্রভাবে বৃষ্টির মধ্যেই সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, ভাবটা—'কুছ পরোয়া নেই, বৃষ্টি পড়ল তো আমার কি!'

বামাকণ্ঠের কাতর আহ্বানে তিনি নিকটে আসিলেন। ঘটনাটি কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া দুর্ব্বৃত্তকে উপযুক্ত দণ্ড দিয়া ত্রাণকর্ত্তা চলিয়া গেলেন। পাগলের তখন মুখ দিয়া গ্যাঁজ

বাহির হইতেছে, একটা চোখ নীল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, মুখে গ্যাঁজের সহিত রক্তের ছিটাও দেখা যায়, তাহার ক্ষীণ স্রোত ভিতর হইতে বহিতেছিল কি না কে জানে!

পরের দিনের কথা, আকাশ পরিষ্কার হইয়া রৌদ্র দেখা দিয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিত বারান্দায় পাগল আর বসিয়া নাই, শুইয়া পড়িয়াছে। দৃশ্যটি বিস্ময়কর, কারণ পাগলকে কেহ শুইতে দেখে নাই, সে সব সময়ই বসিয়া থাকে। শুধু পাগলের শোয়াটাই আশ্চর্য্যজনক ঘটনা নয়, অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় সেই ঘেয়ো কুকুরটা যথেষ্ট বেলা হইলেও পাগলের পাশে বসিয়া আছে। প্রত্যহ ভোর হইবার আগেই সে বারান্দা ছাড়িয়া পলায়, আজ সে মারের ভয়কেও ভুলিয়াছে। এমন সময় গৃহস্বামী রাস্তার বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাগলের নিকট অগ্রসর হইতেই দেখেন, কুকুরটা পাগলের বাহুর উপর মুখ রাখিয়া অনিমেষ নেত্রে রাস্তার দিকে তাকাইয়া আছে। পাগল নড়ে না। বাবুর আবির্ভাবে কুকুর কিছুমাত্র ভীত হয় নাই, বরং থাকিয়া থাকিয়া পাগলের অসাড় বাহুটা চাটিয়া লইতেছে, কুঁইকুঁই করিয়া শব্দ করিতেছে পাগলের ঘুম ভাঙাইবার জন্য, কিন্তু পাগলের শরীরে স্পন্দন নাই, সে পরম শান্তিতে ঘুমাইতেছে। বাবু ভাবিতে লাগিলেন, এ কোন্ দেশী ঘুম বাপু, নেশাখোরেও তো কেহ এমন ভাবে মড়ার মত পড়িয়া থাকে না, তবে কি—! কাছে যাইবারও সাহস নাই, ওদিকে একটু অগ্রসর হইলেই কুকুরটা দাঁত বাহির করিয়া খেঁকাইয়া উঠিতেছে। অভিভাবকত্বের দাবিতে যেন কুকুরটাও একজন প্রতিবাদী হইয়া বসিয়াছে। উপস্থিতবুদ্ধিতে কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়া 'পাঁচির মা, পাঁচির মা' (বুড়ী ঝি) বলিয়া আবার ভিতরে ঢুকিলেন। ঝি তখন ময়লা কাপড় সিদ্ধ করিবার জন্য সাবান-জল ফুটাইতেছিল। কর্ত্তাবাবুর নিকট কুকুরের স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া বিশেষ কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিল না, কেবল একটি জ্বলন্ত চেলাকাঠ বাবুর হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, মারুন বাবু, মারুন, আজ ভোরে আমাকেও তেড়ে এসেছিল, যেমন পাগল, তেমনই তার কুকুর, মেয়েমানুষ দেখলেই তাড়া করে! ঝি নিজে না গিয়া জ্বলন্ত কাঠটি তাঁহারই হাতে তুলিয়া দিবে ভাবিতে পারেন নাই। না যাইলে পৌরুষও ক্ষুণ্ণ হয়, নিরুপায় হইয়াই চেলা কাঠ হাতে বারান্দায় আসিলেন। কিন্তু কুকুরকে প্রহারের প্রয়োজন হইল না; সে আগুন দেখিয়া নিজেই রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

বাবু জ্বলন্ত কাঠটা হাতে রাখিয়াই পাগলকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কি সর্ব্বনাশ! শরীর যে হিম হইয়া গিয়াছে! অবশেষে আজই পাগলটা মরিল!

ইহার পরের ঘটনা পাড়ার লোকে না জানিলেও আমরা জানি। ঘেয়ো কুকুরটা রোজ একবার বারান্দার স্তম্ভের কাছে আসিয়া চারিপাশ শুঁকিয়া যায়। অনেক সময় তাহাকে বসিয়া থাকিতেও দেখা গিয়াছে। সেই আদরের কাঙাল পাগলের অপেক্ষায় কি?

পিণ্ডিতত্ত্ব

পানদোষে অভ্যস্ত অনেকেই কারণে অকারণে অল্পবিস্তর সঙ্কটাপন্ন হইয়া থাকেন। সত্যটি অভূতপূর্ব আবিষ্কার এমন কথা বলিতেছি না, তবে ব্রজেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। ভদ্রলোক সারাটা জীবন আদর্শ চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া হঠাৎ প্রৌঢ় বয়সে বিগড়াইয়া গেলেন। সন্ধ্যার দিকে একটু ঢুকু ঢুকু না করিতে পারিলে ক্ষুধা মন্দ হয়, প্রাণটা আনচান করিতে থাকে। "এবয়সে ক্ষুধা মন্দ হওয়া খুবই স্বাভাবিক, অতএব ঔষধ হিসাবে একটু আধটু চলিতে পারে বৈকি"—কৃপাপ্রার্থী দরদীর দল সোৎসাহে এবং একযোগে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রজেনবাবু সদাশয় ব্যক্তি, অকারণ কাহাকেও ক্ষুণ্ণ করিতে চাহেন না, দরদীদের সদুপদেশ তিনি মানিয়া লইয়াছিলেন। গোড়ার দিকে একটু আধটুর উপর দিয়াই গোপনে স্বাস্থ্য ঠিক রাখিতেছিলেন। ক্রমান্বয়ে স্বাস্থ্যোন্নতির প্রকরণ এমন একটি পর্য্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন গোপন করিবার ইচ্ছায় গলদ না থাকিলেও, মাত্রায় বেসামাল হওয়ার দরুণ গোপন খবর তাঁহার অজ্ঞাতেই কেমন করিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছিল।

মাত্রায় বেসামাল হইলে কি হইবে, আসল ব্যাপারে কিন্তু মানুষটি ঠিক ছিলেন, ধরা পড়িলেও সহজে ধরা দিতেন না। বাধ্যতামূলক গৃহিণীর সান্নিধ্য ঘটিলে যথাসম্ভব সহজ মানুষের মত দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেন, তথাপি গন্ধের উগ্রতায় সন্দিগ্ধ হইতে দেখিলে সুবোধ বালকের মত দোষ স্বীকার করিয়া ফেলিয়া বলিতেন—"একটু বেশী হয়ে গেছে।"

দেহী মাত্রেরই কোন না কোন সময় কম বেশী অসুস্থ হইয়া পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ের ভার চিকিৎসকেই লইয়া থাকেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবুর পরিবারে অন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। শুধু রোগ নয়, সংসারের যাবতীয় অঘটনের কারণ গৃহিণী নির্ণয় করিয়া থাকেন এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় বিশ্লেষণ শেষ হইলে, অধিকতর দুর্ঘটনার জন্য বাড়ীর সকলকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়।

কয়দিন ধরিয়া ব্রজেন্দ্রবাবুর সকালে মাথা ধরিতেছিল। সেদিন সচ্ছলতার অবজ্ঞায় ধন্য—দিবানিদ্রা সারিয়া অপরাহ্ণের দিকে নীচে নামিতেছিলেন, মাঝপথে উপর হইতে স্ত্রী সতর্ক করিয়া দিলেন—নিজের পিণ্ডিগুলো যেন নিজে না গেলেন। অধুনা জীবিতাবস্থাতেই তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া গৃহকর্ত্রী প্রত্যহ একাধিকবার সারিয়া থাকেন, সুতরাং নিজের পিণ্ড নিজে না গিলিলে জীবনধারণেরও আর কোন প্রশস্ত উপায় নাই।

শ্রাদ্ধকারীর বিধান চরম মীমাংসা, "তথাস্তু" বলিয়া ব্রজেনবাবু নীচে নামিলেন। ব্রজেনবাবুর কলিকাতার বাড়ীতেই অন্দর ও বাহির মহল আছে। উভয়ের চৌহদ্দির সীমানা পূর্ব্বপুরুষরা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন একেবারে পাকা পাঁচিল তুলিয়া। তখনকার দিনে বাহির মহলের মজলিসি কথা ভিতর মহলে বড় একটা আসিত না এবং আসিলেও তাহা লইয়া তত কেহ মাথা ঘামাইত না। পুরবাসিনীরা সকলেই জানিতেন পুরুষরা একটু আধটু ওসব করিয়াই থাকে। কিন্তু নবযুগের প্রভাবে এই সংসারেই অনেক পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে। সোমত্ত বয়সের মেয়েরা পড়িতে পড়িতে কলেজ পর্য্যন্ত পাড়ি মারিতেছে। পাড়ার পাতানোদাদাদের সহিত অবলীলাক্রমে বাহির মহলের বুকের উপর দিয়াই হাঁটিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইতেছে, সিনেমা দেখিতেছে এবং বাড়ী ফিরিয়া পরপুরুষের শ্রীবদনের তারিফ করিতে করিতে দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের ঝড় তুলিয়া ছাড়িতেছে। নব-জাগরণে কন্যাদের সহিত গৃহকর্ত্রীও যোগ দিয়াছেন। প্রগতির খরস্রোতে অন্দর বাহির একাকার হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন সনাতন আবরু আর নাই বলিলেই চলে। বে-আবরুর নতুন চাল এমনভাবেই প্রশ্রয় পাইয়াছে যে, দিবা দ্বিপ্রহরে একদিন গৃহিণী সশরীরে নীচে নামিয়া ব্রজেনবাবুকে খাস বৈঠকখানায় বামালসহ গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। বাহির মহলে অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক উপদ্রবের পর হইতে কর্ত্তা সাবধান হইয়া গিয়াছেন। যথেষ্ট সময় থাকিতে গৃহিণীর আগমনবার্ত্তা জানিবার নিমিত্ত নানারূপ সাঙ্কেতিক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। সঙ্কেতগুলি শব্দধ্বনি ও মুদ্রার দ্বারা ভৃত্যের সহিত আদানপ্রদান হইয়া থাকে। আত্মরক্ষার জন্য উক্ত প্রথা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে।

পিণ্ড না গিলিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলেন সত্য, কিন্তু বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতেই অনেকটা নিরাপদ ভাবিবার সুবিধা পাইলেন। এইরূপ সুবিধা সম্বন্ধে মন স্থির হইলেই তিনি খগেনকে ডাকিয়া থাকেন। সেদিনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই, কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল না—খগেন তখনও আরাম করিতেছে। সে হইল খাস কর্ত্তার পুরাতন ও পেয়ারের ভৃত্য। তাহার চালচলন সাধারণের মত হইলে চলিবে কেন? বৈঠকখানায় গভীর রাত্রে সঙ্গীর অভাব ঘটিলে বাবুর রংদার প্রসাদ পাইয়া থাকে এবং রং গাঢ় হইলে দুই চারিটা খোস গল্পও যে না চলে এমন কথা বলিতেছি না। উত্তর না পাইয়া ব্রজেনবাবু দুইবার গলা খাকরানি দিলেন। শ্লেষ্মা বহিষ্করণের শব্দে যে সঙ্কেত নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা বেতারবার্ত্তার মতই সুপ্ত জগতেও ধ্বনিত হইল। অনতিবিলম্বে খগেন মুখে হাতে জল দিয়া বাবুর সামনে আসিয়া গোনা দুইবার কাশিল। ব্রজেনবাবু মাথা দুলাইয়া অসম্মতি জানাইলেন, তৎসহিত একটি "না" শব্দ উচ্চারিত হইল। তাহার পর তুড়ি মারিয়া হাই তুলিয়া বলিলেন, "দুর্গে দুর্গতি নাশিনী"। তুড়ি, হাইতোলা এবং

দুর্গতিনাশিনীর যোগাযোগে যে অর্থ দাঁড়াইল তাহা এইরূপ—"ক্ষণতিষ্ঠ বৎস, এখন যোগাসনে বসিবার সময় আসে নাই, চতুর্দ্দিকে বিঘ্নের সম্ভাবনা অনুভব করিতেছি—কর্ত্রীঠাকুরাণী রঁদে বাহির হইয়াছেন। বিঘ্নের সম্ভাবনা তিরোহিত হইলেই দীক্ষার ব্যবস্থা করিব।"

ভৃত্য-ও-শিষ্য নিরুপায় হইয়া কাতরস্বরে বলিল—"তা'হলে বাবু, ফর্সিটা তৈয়ার করে আনি?" ব্রজেনবাবু এবার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "হুঁ।" সাধক শিষ্যের অনুরোধ কতই আর প্রত্যাখান করা যায়!

তৈয়ার ফরসি যখন আসিল তখন তাহার রূপান্তরিত কলেবর দেখিয়া শুধু অবাক্ হই নাই, মুগ্ধ হইয়া গেলাম। অপূর্ব্ব সাঙ্কেতিক ভাষা। তৈয়ার ফরসি আসিয়াছে স্বচ্ছ কাচের জলপাত্রের রূপে। আধারস্থ বস্তুর বাহ্যিক আকার জলেরই মত, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করিলে জলবৎ পদার্থ টি 'জিন্' বলিয়া প্রমাণিত হইবে। পান করিলে রীতিমত রং ধরে,—ধরা না পড়িলে জল বলিয়া মানিতে হয়।

যে সময় ছদ্মবেশা 'জিন' ব্রজেন্দ্রবাবুকে কল্পনা-রাজ্যে অগ্রসর করিয়া দিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই বিপদের আশু সূচনা বৈঠকখানার আনাচে কানাচে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গুচ্ছবন্দী চাবির আওয়াজ দূরে শুনা যাইতেছিল। কথায় বলে—"যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়!"

তৈয়ার ফরসি দিয়া খগেন আটপৌরে ফরসি আনিতে বাহির হইয়াছিল, মাঝ-পথ হইতে ফিরিয়া দরজার নিকট বাঘের আগমনবার্ত্তা ফেউ ডাকার মত বলিয়া গেল, "সরবৎ!"—অর্থাৎ বাঘ এই রাস্তাতেই আসিতেছে।

শিষ্য 'সরবৎ' বলিয়া সরিয়া পড়িলেই গৃহিণী ঘরে ঢুকিলেন এবং কিছুমাত্র গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া বলিলেন—আজ তা'হলে কিছু খাচ্চ না তো?

কর্ত্তা অবাক হইয়া মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। গৃহিণী সেদিকে দৃকপাত না করিয়া বলিয়া চলিলেন—"তিন চারদিন ধ'রে মাথাধরা রয়েছে মানেই লিভারটি একেবারে গেছে—শেষ পর্য্যন্ত "সিরোসিসে" না গিয়ে দাঁড়ায়।"

অসুখ বিসুখের নাম সম্বন্ধে ব্রজেনবাবুর তেমন অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু গৃহিণীর আছে। তিনি ডাক্তারের দৌহিত্রী, উত্তরাধিকারসূত্রে চিকিৎসা বিদ্যার অনেক জটিল জ্ঞান তাঁহার উপর বর্ত্তাইয়াছিল। পরিবারে ছোটখাট চিকিৎসার কাজ তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজেই সমাধান করিতেন এবং রোগ সঙ্কট অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইলে বলিতেন, "ভাগো সময়মত ওষুধটা পড়েছিল! তা না হ'লে বেচারা...." অর্থাৎ লোকটা এমনেও মরিত, ওষুধের গুণে কয়েকটা দিন বেশী বাঁচিয়া গেল।

ব্রজেনবাবু নীরবে নিজের ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় পুনরায় গৃহিণী জিজ্ঞাসার অজুহাতে আদেশ করিলেন—"আজ কিছু খাচ্ছ না তো ?"

ব্রজেনবাবু ভীত ও সপ্রশ্ন নয়নে স্ত্রীর দিকে তাকাইলেন।

দৃষ্টির অর্থ গ্রহণ করিয়া স্ত্রী বলিলেন,—ওসব ভালমানুষি আমি বুঝি, তোমাকে জানাতে এলাম আজ রাত্রে তুমি খাচ্ছ না।

দুঃসংবাদ দিগম্বররূপে প্রকাশিত হওয়ায় গৃহিণীর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ব্রজেনবাবুর মর্ম্মে প্রবেশ করিল,—কৃপাপ্রার্থীর ন্যায় তিনি বলিলেন—খাচ্ছি না, কেন ?

গৃহিণী বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন,—এক কথা আর কতবার বলব ? তোমার লিভারটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, কিছুদিন সাবধানে না থাকলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে যে !

রোগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলে গৃহিণী শ্রাদ্ধের কথাই সচরাচর তুলিয়া থাকেন। কিন্তু এখন তাহা বলিলেন না, তবু রক্ষা। ব্রজেনবাবু শুধু নীরব রহিলেন না, নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। এমত অবস্থায় গৃহিণীর সামনে চুপ করিয়া থাকাই এ বাড়ীর নিয়ম।

আদেশ শিরোধার্য্য হইয়াছে বুঝিয়া চাবির গোছা ঝনাৎ করিয়া পিছনদিকে ফেলিয়া ফিরিবার পথে বলিয়া গেলেন—সকাল সকাল উপরে এস, বুঝলে ? রাত ক'রো না রোজকার মত। ক্যাষ্টর অয়েলটা খেতে হবে মনে থাকে যেন ! যে-না ধাত তোমার, তার ওপর ওষুধ খাবার সময় ন্যাকামিটি আছে ষোল আনা ! গরম চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেব'খন, সে চমৎকার লাগবে।

শুভ খবরটি শুনাইয়া গৃহিণী বৈঠকখানা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। ব্রজেনবাবু গুম্ হইয়া বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ বাদে খগেন এদিক ওদিক চোরাই চাহনী হানিয়া যেন পিছলাইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল এবং ঢুকিয়াই বলিল—তা'হলে রামপাখীর ওটা কি হবে বাবু ?

চতুর চাকর—কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সব কথাই কোন গোপন স্থান হইতে শুনিয়াছিল। পক্ষী-মাংসটির প্রতি খগেনের অসাধারণ পক্ষপাতিত্ব ছিল। কুক্কুটের পদলেহন সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হওয়ায় প্রশ্নটি অন্তঃপ্রবাহে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

সমস্যার কথা—একদিকে লোভনীয় কুক্কুটের মাংস একযোগে চাট ও আহার, অপর দিকে এরণ্ড তৈল ! তিন চারবার কপালে তর্জ্জনীর দ্বারা টোকা মারিয়া শ্লেষ্মা বহিষ্করণের সঙ্কেত দিয়া ফেলিলেন। খগেন মনে মনে 'দুত্তোর' বলিয়া চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই বড় রেকাবে সুদৃশ্য ভাবে সাজাইয়া আসল জিনিষ লইয়া ফিরিল এবং ক্ষিপ্রতাসহ ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ইতিমধ্যে সাহা-মহাশয় ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। সাহা-মহাশয় ব্রজেন্দ্রবাবুর বাল্যবন্ধু। তাঁহারই

দোকানের মাল এখানে সরবরাহ হইয়া থাকে। ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন,—কাল আসল ফরাসী মাল পাঠিয়েছিলাম, কেমন লাগল?

তাঁহারই পাঠান মাল সামনে মজুত, এক চুমুক গলাধঃকরণ করিয়া ব্রজেনবাবু বলিলেন,—রোস, ভেতরের কাজ না দেখে তো বলা যায় না। বিচার ঠিক করিবার জন্য দ্রুত আর দুই পেগ খাইয়া ফেলিলেন। খগেন জানিত এই সময় তাকিয়ার প্রয়োজন হইয়া থাকে, যথাস্থানে তাকিয়াটী রাখিয়া দিল। দেহভার তাহার উপর চাপাইয়া ব্রজেনবাবু প্রশ্ন করিলেন,—আচ্ছা, বলতো ভাই সা'—রেড়ীর তেল সুস্বাদু হ'লে কি রকম খেতে লাগে? সাহা-মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—ভাল রেড়ীর তেলের মতই।

ব্রজেনবাবু—ভেবে দেখ, গিন্নী আজ এই ভাল জিনিষ খাবার জন্য স্বয়ং এসে নিমন্ত্রণ ক'রে গিয়েছেন। এখন কি করা যায় বলত ভায়া?

সা'মশাই বলিলেন,—পেটে কিছু না পড়লে বুদ্ধি খোলে না। কৈ হে, আমার ভাগটা কি হোল খগেনচন্দ্র? সা'মশাই বুদ্ধিমান এবং ব্যবসায়ী লোক। মালে ভাগ চাহিয়াছিলেন নিরবচ্ছিন্ন গুণাগুণ বিচার করিয়া দিবার জন্য। বন্ধুলোককে প্রতারণা করা যায় না। জবরদস্ত চুমুক দিয়া বলিলেন,—ভাল মাল হে!

ব্রজেনবাবু—তাই তো মনে হচ্ছে, কিন্তু ক্যাষ্টর অয়েলের কথা ভাবতেই সব যে মাটি হয়ে যাচ্ছে!

সা'মশাই বিশেষ চিন্তার পর বলিলেন,—তুমি যে ভাবিয়ে তুললে হে। আমি বলি এবারটা তুমি গৃহিণীর কথাই রাখ—ওটা খেয়ে ফেল। খেতে তেমন মুখরোচক না হ'লেও ফল ওতে ভালই হয়।

ব্রজেনবাবু চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন,—অ্যাঁ, বল কি? খেয়ে ফেলব? এবার নিয়ে এই মাসের ভিতরই যে তিনবার হয়ে গেল, সে খবর রাখ?

সা'মশাই—তা হোক, গিন্নী যখন বলছেন, তখন তাঁর অনুরোধটা রাখা উচিত। লিভারের কাজ ঠিক হচ্চে না. এইটুকু মানলেই যদি গোল মিটে যায় তা'হলে মেনে নেওয়াই তো ভাল। ঘরোয়া মনকষাকষি পুষে রাখতে নেই, বুঝলে হে।

ব্রজেনবাবু বন্ধুর উপদেশে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—বল কি, একটা গোটা মুরগী রোজ হজম ক'রে ফেলছি, তবু আমার লিভার খারাপ কি রকম? এ কোন দেশী অনুরোধ, অসুখ নেই তবু মেনে নিতে হবে আমি অসুস্থ!

সা'মশাই—দেখ, তোমার শরীর খারাপ হ'লে তোমার চেয়ে আমারই ক্ষতি বেশী। বাজে

মাল খেয়ে খদ্দেররা দোকান বদ্‌লি ক'রে ফেলবে। তোমার এখানে চেখে নিয়ে তবে আমি খদ্দেরকে জিনিষ ছাড়ি কিনা! ভেবে দেখ, আমি তোমার জন্যই ক্ষতি স্বীকার ক'রে নিচ্ছি।

কথাটা সত্যই বটে, ব্রজেনবাবুর শরীর খারাপ হইলে সাহা-মহাশয়েরই ক্ষতি বেশী। নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্রজেনবাবু মনিয়া লইলেন তাঁহার যকৃতের কাজ ঠিকমত চলিতেছে না।

কিছুদিন পরের কথা—ব্রজেনবাবু সুস্থ দেহে পথ্য খাইতেছেন। সা'মশাইও প্রত্যহ আসিতেছেন এবং মাল চালানও যথানিয়মে চলিতেছে। মাঝখান হইতে সা'মশাইয়ের কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে কোন বিশিষ্ট তাজা সামগ্রী পরীক্ষা করিলেই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইত। ব্রজেনবাবুর যকৃত অচল হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন লেবেলমারা জিনিষ আসিতেছে। এ অবস্থায় তো কড়া জিনিষ দেওয়া চলে না। প্রাণের আন্‌চান্ ভাবটা সামলাইবার জন্য নেহাৎ যেটুকু পথ্যের উপযুক্ত না দিলে নয় তাহাই দিতেছেন। গৃহস্থের বাড়ীতে যেমন বাসী মড়া রাখিতে নাই; সেইরূপ মার্জ্জিত-রুচিসম্পন্ন হইতে হইলে বোতলে উদ্‌বৃত্ত অংশও বাসী হইতে দেওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সা'মশাই বন্ধুর অকল্যাণের ভয়ে দুই একটা ঝাঁজহীন বোতল একেবারে ফাঁপা করিয়া রাখিতেছিলেন।

বাধ্যতামূলক রোগের তদ্বির তো আছেই, তদুপরি আর এক উপদ্রব আসিয়া জুটিল। ব্রজেনবাবুর বড় মেয়ের পাকা দেখার দিন স্থির হইয়া গিয়াছে। বরপক্ষীয়রা এমন একটি সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, যখন ব্রজেনবাবু আন্‌চান্ ভাবটা কাটাইবার অবকাশ পান। সঙ্কটাপন্ন হইয়া শুভাকাঙ্ক্ষী সাহা-মহাশয়কে ব্রজেনবাবু আসন্ন দুর্দ্দিনের কথা বলিয়া ফেলিলেন।

ঘটনাচক্রের ফলে ব্রজেনবাবুর ভাবী বৈবাহিককে সাহা-মহাশয় চিনিতেন। পরিচয় ঘোড়-দৌড়ের মাঠে। বাজি মারিয়া ভদ্রলোক সা'মশাইয়ের ষ্টল-এ জিন্‌কে জানাইয়াই পান করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার ভার সাহা-মহাশয়কেই লইতে হইয়াছিল। ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত সা'মশাই-এর দরদকে মধ্যস্থ করিয়া।

সা'মশাই বলিলেন,—আরে, তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? তোমার বেয়াইকে আমি চিনি, অনেক দিনের আলাপ। লোকটা ঘুঘু-মার্ক হে, ডুবে ডুবে জল খায়! আমাদের তুলনায় নেহাৎ ছোকরা, কাঁচা বয়সে বিয়ে করার ফলে ছেলে বড় হ'য়ে উঠেছে।—কুছ পরোয়া নেই, আসুক তোমার বেয়াই! শর্ম্মা যখন রইল তখন ভয়টা কিসের, সব লালে লাল ক'রে দেব'খন!

ব্রজেন্দ্রবাবু সা'মশাই-এর প্রস্তাব শুনিয়া আতঙ্কিত হইয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন—ভাই, গিন্নী যদি জান্‌তে পারে?

সা'মশাই বক্ষের উপর পালোয়ানি চাপড় মারিয়া উত্তেজিতভাবে বলিলেন,—তবু কুছ পরোয়া নেই, সে আমি দেখে নেব।

মেয়ে দেখার দিন। ব্রজেন্দ্রবাবু আজ একটু আগেই নীচে নামিতেছিলেন। প্রত্যহ এই সময়টিতে মদ্যপানহেতু অনিবার্য্য ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার কথা কর্ত্রী স্মরণ করাইয়া যান। কর্ত্তা ভাবিয়াছিলেন আজ অন্ততঃ রেহাই পাইবেন। কন্যার পাকা দেখার দিন, বিশিষ্ট অতিথিদের অভ্যর্থনার আয়োজনের নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিবেন। কিন্তু দৈনন্দিন নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটিল না। মোটা চটির আওয়াজ শুনিয়াই গৃহিণী হন্তদন্ত করিয়া সিঁড়ির চাতালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থূল দেহভার দ্রুত বহন করায় হাঁপাইয়া গিয়াছিলেন, তাহার উপর অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য সাধন। অন্যদিন অপেক্ষা কঠোর হইয়াই বলিলেন,—"মাথাধরা লুকিয়ে রেখে আমার হাড়গোড় জ্বালিয়ে খেয়েছ। পৈ পৈ ক'রে বারণ করেছিলাম এখন হ'ল তো! আমার কথা ফল্‌ল তো! লিভারটি একেবারে গেছে, বুঝেছ?

মাথাটা আসলে ব্রজেন্দ্রবাবুর কিনা—সে বিষয়েই সন্দেহ উঠিয়া পড়িয়াছে, তবু তিনি উত্তর দিলেন,—আমার মাথাধরা তো কবে সেরে গেছে।

গৃহিণী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন,—বলিয়া চলিলেন,—কি বললে, সেরে গেছে? আহা, কথার কি ছিরি! একে মাথাধরা, তার উপর আর একটি বাধিয়েছেন,—দাঁতের বেদনা। সেদিন রাত দুপুরে ফোমেণ্টেশন্ দিতে দিতে মরি। এ সব ঐ ছাই, পিণ্ডি গেলার জন্যেই তো? সেরে গেছে! আমার কথা না শুনে যা খুসী করবেন; তার ফলে আমার গতরখানি পর্য্যন্ত যেতে বসেছে।

শত্রুর মুখে ছাই দিয়া বলিতে পারি কর্ত্রী ঠাকুরাণীর গতর যাইয়াও যেটুকু আছে, তাহা একটি বুভুক্ষু শার্দ্দূল পরম পরিতোষের সহিত দুই দিন আহার করিতে পারে।

দাঁতের বেদনা আগের ঘটনা। তখন ব্রজেন্দ্রবাবু গোটা দুই দাঁতের মালিক ছিলেন এবং জখমি দাঁত বলিয়া দারুণ যন্ত্রণাও অনুভব করিয়াছিলেন। ডাক্তারের পরামর্শ লইতে যাওয়ায় তিনি দক্ষিণার সহিত দুইটি দাঁতও তুলিয়া রাখিয়া দিলেন। উপযুক্তভাবে প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বে দাঁত ডাক্তারের হস্তগত হইয়া গিয়াছিল। সাফাই হাত নিশ্ পিশ্ করিতেছিল—ভীত রোগীকে দেখিয়া কর্ত্তব্যবোধকে ডাক্তার বাধা দিতে পারেন নাই। তিরস্কারের নব উদ্ভাবিত কারণ ডাক্তারদত্ত বাঁধান দাঁত উপলক্ষ করিয়া। ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের সামনে ফোগলা মুখ লইয়া বাহির হইতে চান নাই, সেই কারণে সকালে নবনির্ম্মিত দন্তপংক্তি মুখ গহ্বরে পুরিয়াছিলেন। নবাগতের সংস্পর্শে জিহ্বা ও তালুর সংঘর্ষণ দারুণভাবে অস্বস্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল, আপন মনেই

বলিয়াছিলেন,—ইস্, লাগে যে! তালুটা শেষ পর্য্যন্ত কেটে যাবে নাকি? বমি আসে যে, ইত্যাদি। উক্ত পীড়নজড়িত আত্মপ্রশ্নগুলি সশব্দে উচ্চারিত হওয়ায় কর্ত্রী ঠাকুরাণী কুটনা কুটিতে কুটিতে অলক্ষ্যে শুনিয়া ফেলিয়াছিলেন। ফলে আসল দাঁতের কথা বিস্মৃত হইয়া নকল দাঁতকে উপলক্ষ করিয়াই ফোমেণ্টেশনের কথা মনে পড়িয়া গিয়াছিল। ব্রজেনবাবুর প্রতিবাদ করিবার সাহস নাই। গত্যন্তর না থাকায় বাঁধান দাঁতের বেদনা লইয়াই নীচে নামিলেন।

ঘরে ঢুকিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিলেন কেমন একটি জমকাল ভাব। অনেকগুলি ভাড়া করা তাকিয়া ও ফুলদানী আসিয়াছে। ফুলদানী দুইটিতে বড় স্বদেশী জমাট তোড়া। ফুলগুলিকে ঠাসিয়া কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করা হইয়াছে। তাহারই মধ্যস্থলে সাহা-মহাশয় আমীরি চালে বসিয়া আছেন, বেশের পারিপাট্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চাল-চলনে মৌজ লাগিয়াছে, চক্ষু দুইটি রক্তিমাভ ও ঢুলুঢুলু।

ব্রজেন্দ্রকিশোর ঘরে ঢুকিতেই সাহা-মহাশয় সম্বর্দ্ধনা জানাইলেন—"স্বাগতম্"। তোমার বেয়াইকে আজ 'শ্যাম্পেনে' চুবিয়ে দেব, বুঝলে কিনা! খরচের কথা ভেব না; ধীরে সুস্থে চুকিয়ে দিলেই হবে। তুমি তো ঘরের লোক। তোমার এখানে মাল দেওয়া মানে কাঁচা টাকা লক্ষ্মীর সিন্দুকে তোলা।

ব্রজেন্দ্রবাবু বলিলেন—তুমি যে দেখ্ছি আগে থাকতেই চালিয়েছ, অ্যাঁ? দেখো ভাই, বেয়াইমশাই যেন আমাদের মাতাল না বলে যান।

সা'মশাই তখন সুরা-বিরোধীদের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া ফেলিয়াছেন। ব্রজেনবাবুর অর্থহীন আতঙ্কে গুম্ফ উর্দ্ধদিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন,—দামী মাল খেয়ে যদি একটু নেশাই না ধরল তো পয়সা খরচ ক'রে লাভ? রং চড়া মানেই তো একটু মকারের আত্মপ্রকাশ। অবশেষে তুমিও কিনা বেরসিকের খপ্পরে পড়লে!

সাহা-মহাশয়ের যুক্তিগুলি অকাট্য। সত্যই মদ্যপ যদি উপযুক্ত পানের পর মাতাল বলিয়াই প্রতিপন্ন না হইল তো সরল জলে তুষ্ট থাকিলেই হয়? তিনি নিজের দোকানেই দেখিয়াছেন কেবলমাত্র ছিপির গন্ধ শুঁকিয়া লোকে মাতলামির ভান করিয়াছে। ইহার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে জানা যাইবে, মাতাল হইবার পিছনে গৌরবাত্মক প্রতিষ্ঠার একটি গাঢ় আকাঙ্ক্ষা আছে। সাহা-মহাশয়ের যুক্তিতে মাতাল নয় কে? ধার্ম্মিক হইতে রাজনৈতিক, শিল্পী, কবি সব মাতাল, যে যাহার পেশা অনুসারে আনন্দের নিমিত্ত প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক চিন্তা করিয়া থাকে। শুধু চিন্তা করিয়া থামিলেও বা রক্ষা ছিল, চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অধ্যবসায়কে অদমনীয় করিয়া তোলে, কাজে আত্মহারা হইয়া যায়। এইরূপ আত্মহারা হওয়া সাধারণ সুস্থ মানুষের পক্ষে

অস্বাভাবিক। চিন্তাগ্রস্ত ভিন্নপন্থী আত্মহারাকে লোকে বলে কাজে মাতিয়াছে, অথচ একটু মদ পান করিয়া আত্মহারা হইলেই সে হইল মাতাল! সুবিচার বটে! কাজে মাতিয়া যাহারা আত্মহারা হয়, তাহারাও অনেক সময় কর্ম্মব্রতে ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইয়া থাকে, অনেক ভুলচুক করিয়া থাকে। মাতালও আনন্দের উদ্দেশ্যে খরচ করিয়া মশ্‌গুল হইতে চায়। ধার্ম্মিক, রাজনৈতিক, শিল্পী, কবি কাজ করিয়া অনুকূল ঘটনাচক্রের ফলে একের অধিককে শান্তি ও আনন্দের উপকরণ যোগাইয়া থাকে; মাতাল নিজের আনন্দেই বিভোর হইতে চায়—সুতরাং মাতালের সংখ্যা যদি বাড়িয়া যায় তো আনন্দ ভোগের অধিকারীও ভিন্নভাবে বাড়িয়া যাইবে এবং সমাজের সব মানুষই যদি মাতাল হইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকে তো দুঃখের প্রশ্নই ওঠে না। আনন্দ সংগ্রহই মানুষের চরম লক্ষ্য, প্রভেদ কেবল স্তর ও প্রকরণে। তাহাও কাল, আবেষ্টনী এবং ব্যক্তিগত রুচি হিসাবে বিচার সাপেক্ষ।

উক্ত যুক্তি সাহা-মহাশয় ব্রজেনবাবুকে দীক্ষা দিবার পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছিলেন, তাহার ফলে আজ ব্রজেনবাবু সিদ্ধপুরুষ। সিদ্ধিলাভের পরেও মদ খাইয়া মাতাল হইলে যে মানুষ মাতলামীকে অপকর্ম্ম ভাবিতে পারে, তাহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিতে হয়। আত্মাভিমান থাকিলে এমন কথা সুরার উপাসক বলিতে পারে?

সাহা-মহাশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া ছিলেন, বলিলেন—আমাদের মাতাল বলবে কি হে? মদের ব্যাপারে আমি বনেদী ঘরের ছেলে, চোদ্দপুরুষ এই কারবার ক'রে এল। আসুক তোমার বেয়াই তাকে যদি........,কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ব্রজেনবাবু সাহা-মহাশয়ের মুখে হাত দিয়া বলিলেন—ওহে আস্তে আস্তে, গিন্নী এদিকে আজ দুই একবার হানা দেবেই। প্রতিমার ভাবী শ্বশুরের চেহারাটা নয়নজুড়ান রাজপুত্তুরের মতো তাতো জান? বয়স ভাঁড়ান শ্রীবদন এক আধবার না দেখে কি গিন্নী চুপ করে থাকবেন?

সাহা-মহাশয় কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নাম শুনিয়া শান্ত হইলেন বটে, কিন্তু পৌরুষকে খর্ব্ব করিতে পারিলেন না। বলিলেন—আজকের দিনে মেয়েদের অত ভয় ক'রতে নেই, তুমি হ'লে বাড়ীর কর্ত্তাব্যক্তি, একটু দমভারি হওয়া দরকার। তাছাড়া দেখ না, দলে বাড়াবার কি রকম ব্যবস্থা ক'রেছি। কিছু মনে ক'রো না ভাই, তোমার আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারিনি; একটা বোতল খুলে ফেলেছি। বেশীর ভাগই বরফের বাল্‌তিতে পোরা আছে, তোমার জন্যে জিইয়ে রেখেছি। জাতে শ্যাম্‌পেন কিনা, বেজায় সৌখীন জিনিষ! একটু তোয়াজ না পেলেই গেল। এস ভাই, তাড়াতাড়ি বোতলটা খালি করে দিয়ে যাও।

শ্যাম্‌পেনের নাম উঠিতেই ব্রজেনবাবুর প্রাণ আন্‌চান্ করিয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর

বরফে মজার খবর! ব্রজেনবাবুও মজিলেন, গৃহিণীর ভয়াল রূপের কথা ভুলিলেন, নিজের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়ার সুব্যবস্থার জন্য অগ্রসর হইয়া গেলেন।

সাহা-মহাশয় ব্রজবাবুর মত না লইয়াই খগেনের সাহায্যে অভিনন্দনের অধিকন্তু ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। বৈঠকখানার পাশেই ঘুপ্‌চিমারা প্রাচীনকালের অন্ধকূপ; অধিকন্তুর ব্যবস্থা উহারই অভ্যন্তরে হইয়াছিল। ব্রজেনবাবু মজিতে ঢুকিয়াছিলেন, মজিয়াই ফিরিলেন। ইতিমধ্যে বরপক্ষীয়রা আসিয়া উপস্থিত।

শিক্ষিতা ডাগর মেয়ে পছন্দ করিতে আজকাল বর নিজে আসিয়া থাকে। যিনি বর হইবেন, তিনি কলেজের পড়ুয়া হইলেও প্রাচীন নিয়মে খড়মে সায়েস্তা ছেলে। ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের পরিবারে মেয়ে দেখার দায়িত্ব গ্রহণ গুরুজন ব্যক্তিরা বংশানুক্রমে বহন করিয়া আসিতেছেন। নববধূ তো কেবল ছেলের বৌ নয়, সংসারের দাসীও বটে। কর্ম্মপটুতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হইলে অবথা মাহিনা দিয়া একটি দাসী রাখিতে হয়। ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের বয়স কম হইলে কি হইবে, এদিক দিয়া তিনি ভাবিক্কে চাল বজায় রাখিয়াছেন। পাকা দেখার ব্যাপারে অনেক হিসাবের তালিকা থাকায় বিচক্ষণ ব্যক্তি পাড়ার যোগীনখুড়াকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। এসব বিষয়ে তাঁহার বিচার নির্ভরযোগ্য।

ভাবী বৈবাহিক মহাশয় গুছাইয়া বসিবার পূর্ব্বেই সা'মহাশয় অধিকন্তুর প্রস্তাবটা গুছাইয়া বলিয়া ফেলিলেন। সাহা মহাশয়ের ক্রিয়াকলাপে সম্মোহন শক্তি আছে, তাহা না হইলে যোগীন-খুড়াও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন কেন? সলজ্জ প্রতিবাদ উঠিলেও তাহা সম্মতির আভাস। দেখা গেল, অনতিবিলম্বে বাক্যব্যয় থামিয়া গিয়াছে এবং যোগীনখুড়াসহ ভাবী বৈবাহিক মহাশয় গোপন ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন।

দেশী প্রথায় শ্যাম্‌পেনের ব্যবহার সরবতের মতই হইয়া থাকে। ভাবী বৈবাহিক ও যোগীন-খুড়া এক চুমুকে গেলাস খালি করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। খগেন নিকটেই ছিল। রসাল ব্যাপার শেষ হইতেই জড়িত ভাষায় হাসির সঙ্কেত দিয়া বলিল,—আজ্ঞে তাহ'লে গিন্নীমাকে খবর দিয়ে আসি?

গৃহিণীর নামেই ব্রজেন্দ্রবাবু চমকিত হইয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন,—তুই যাসনে ধরা পড়ে যাবি, ঝিটাকে বরং ডাক। ঝি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল, আসিতে পারিল না। খগেন খানিকটা আতরসিক্ত তুলা কাণে গুঁজিয়া অন্দরমহলে খবর দিয়া আসিল।

ঘটনাটি ব্রজেনবাবু সহজভাবে লইতে পারেন নাই। খগেন ভিতর বাড়ীতে গিয়াছে মানেই গন্ধগোকুল জানোয়ারের অস্তিত্বের মতই তাহার মুখের গন্ধে সব-কিছুই ফাঁস হইয়া গিয়াছে।

ঝিটার প্রতি মনে মনে চটিয়া উঠিলেন,—বাড়ীতে বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত না থাকিলে একটা তুমুল কাণ্ড করিয়া ছাড়িতেন। "গতস্য শোচনা নাস্তি", যাহা কপালে আছে তাহা ঘটিবেই।

যথাসময় কর্ত্রী ঠাকুরাণী কন্যাকে সাজাইয়া বৈঠকখানায় পাঠাইয়া দিলেন। যোগীনখুড়া বুঁদ অবস্থায় বসিয়াছিলেন, কিন্তু পাঁইজর ও ঝুমকি পরিয়া সুন্দরী ডাগর মেয়ে ঘরে ঢুকিতেই সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। খুড়ামহাশয় নারীর সৌন্দর্য্য-বিচার সম্বন্ধে একজন রসগ্রাহী ব্যক্তি! ডাগর মেয়েদের তিনি পছন্দ করেন, তাহার উপর প্রতিমার গঠন-সৌন্দর্য্য তাঁহাকে সহজেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। কালবিলম্ব না করিয়া সকলের সমক্ষে ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের কানে কানে একটি রসাল উপদেশ দিয়া ফেলিলেন। ফরাসী দ্রাক্ষারস ইতিমধ্যে বরকর্ত্তাকে এমন একটি মার্গে তুলিয়া ফেলিয়াছিল যে, তাঁহার দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের কথাটাই ভুলিয়া বসিয়াছিলেন। বরকর্ত্তার বাহুদৃশ্য প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, ইতিমধ্যে দরজার আড়ালে মেয়েদের মধ্যে সুদর্শন পুরুষ সম্বন্ধে অনুকূল মন্তব্যেরও আদানপ্রদান হইয়া গিয়াছে। খুড়ার গোপন উপদেশ ভাবী বৈবাহিক মহাশয় প্রকাশ্যেই স্বীকার করিলেন। নতনয়নে প্রতিমা দাঁড়াইয়াছিল। যোগীন-খুড়া সাহা-মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন, মেয়েকে একটু হাঁটান দরকার। ব্রজেনবাবুর তাহাতে আপত্তি ছিল না। ক্ষুদ্র পরিধির ভিতরই প্রতিমা তিন চার পাক ঘুরিয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের মনে তখন রং লাগিয়াছে। কন্যার অপূর্ব্ব গঠন দর্শনে প্রীত হইয়া একটি অবান্তর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। কথাটা শুধু অবান্তর নয়, বরের পিতার মুখে অমন কথা উচ্চারিত হওয়াও অশোভনীয়। দরজার পাশে মেয়েদের ফিস্‌ফাস আলোচনা সুরু হইয়া গেল। আলোচ্য বিষয় বৈবাহিক মহাশয়ের ভাবোচ্ছ্বাস লইয়া। যথারীতিতে নারী-প্রদর্শনী শেষ হওয়ায় প্রতিমা ভিতর বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণ বাদে ঝনাৎ করিয়া দরজার পাশেই চাবির আওয়াজ হইল। সঙ্কেতটিতে কোনরূপ রহস্য জড়িত ছিল না, একেবারে সোজা কথা, গৃহিণী কোন জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিয়াছেন। চাবির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেন্দ্রকিশোরের টনক নড়িয়া গেল, বৈবাহিক মহাশয়ের প্রস্তাব মাথায় ঘুরিতেছিল। অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিলেন,—অ্যাঁ! পরের ঘটনা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল, গৃহকর্ত্তাকে ভিতর বাড়ীতে ডাক পড়িল। শৌখীন জিনিষ জিয়াইয়া রাখিবার উপায় না থাকায় যে পরিমাণে তাহা গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন, তাহা পিণ্ডী গেলার অবস্থাতেই আসিয়া পড়িয়াছিল। পায়ের টাল সামলাইতে গিয়া মুখের কথা বেসামাল হইয়া যাইতেছিল, তথাপি গৃহিণীর সামনে নিরীহ প্রাণীর ন্যায় দাঁড়াইবার চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নাই।

ব্রজেনবাবু ভিতরবাড়ীতে ঢুকিবার আগে সা'মহাশয়ের নিকট মতলব লইয়া আসিয়াছিলেন।

বিপদে তাঁহার বুদ্ধিই শেষঅবলম্বন, কিন্তু গৃহিণীর জেরার মুখে কোন্ প্রশ্নের কোনটি সঠিক উত্তর হইবে ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। গৃহিণী বলিলেন,—একি কাণ্ড, ছেলের বৌ দেখতে এসে নিজে বিয়ে কারতে চায়!

ব্রজেনবাবু এইরূপ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসেন নাই। সা'মহাশয় কেবল পিণ্ডি

গেলার সত্নত্তরগুলি ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে গিয়া বলিয়া ফেলিলেন,—আরে চটো কেন? ওটা রসিকতা। বৈবাহিক মানুষ একটু আধটু রসের কথা না বললে মানায়? গৃহিণী চাবির থোকা সংযুক্ত আঁচলটা পিঠে না ফেলিয়া বিপদসঙ্কুল কেন্দ্রের ভিতর ঘুরাইতে লাগিলেন—কারণ ছিল। বাবুর পেয়ারের ভৃত্য খগেন প্রতিমার সামনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দোলাইয়া অপমানকর কথা বলিয়াছে। বেচারাকে দোষী করা চলে না, তথাপি ঘটনাটি দূষণীয়: সে অযাচিতভাবে কতকগুলি উপদেশ দিয়া ফেলিয়াছিল—প্রদর্শনীগৃহে প্রতিমার হাঁটাটা যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হয় নাই, এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়ায় নিজের অঙ্গ দুলাইয়া কিভাবে পুরুষের চিত্ত আকর্ষণ করিতে হয় দেখাইয়া দিয়াছিল। অঙ্গভঙ্গীতে ভব্যতার অভাব থাকায় অভিমানিনী কন্যা তাহার শাস্তির বিধান-অপেক্ষায় নিরালায় বসিয়া কাঁদিতেছিল।

গৃহিণী চাবির থোকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে রোরুদ্যমানা কন্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গম্ভীর গলায় বলিলেন, কি দেখছ? কর্ত্তার তখন আর সহজ দৃষ্টি নাই, পিণ্ডির প্রক্রিয়ায় ঝাপসা হইয়া গিয়াছে; তদুপরি কন্যাও আলো আঁধারিতে বসিয়াছিল। তাহাকে দাসী ভাবিয়া রুখিয়া বলিয়া উঠিলেন—ওকে এখুনি বাড়ী থেকে বার করে দাও, হারামজাদি! ওর এত বড় স্পর্দ্ধা ডাকলে আসে না, তার উপর আমার সামনে বসে থাকে!—অ্যাঁ, আঁস্তাকুড়ের ঝি, অ্যাঁ!

কন্যা পিতৃ-উক্তি শুনিয়া সত্যই উঠিয়া দাঁড়াইল। একে চাকরের নিকট অপমান, তাহার উপর ভৃত্যকে কিছু না বলিয়া অকারণ কন্যাকেই শাসন। ডাগর, শিক্ষিত মেয়ে চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া বলিয়া ফেলিল,—ওঁর সঙ্গেই বিয়ে দাও বাবা, বারে বারে আমাকে বাজারের জিনিষ কেনার মত দেখতে আসা আর ভাল লাগে না। তার উপর চাকরের কাছ থেকে অপমান। তোমার গালাগালি, অসহ্য হয়ে উঠেছে। স্বামীর বাড়ীতে ঝাঁটাজুতো খেয়েও পড়ে থাকব, কিন্তু বাপের বাড়ীতে নয়।

মেয়ের কথায় ব্রজেন্দ্রকিশোরের হুঁস হইল। তিনি হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন। কটুভাষা যে নিজের কন্যার উপর প্রয়োগ করেন নাই তাহা প্রমাণ করিবারও অবকাশ পাইলেন না।

গৃহিণী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন,—কাঁদিসনে মা, এ ভবিতব্যের কাজ, তোর ভালই হবে আমি আশীর্ব্বাদ করছি। এ পিণ্ডি গেলার বাড়ীতে থাকিস নে। যেখানে চাকর বেলেল্লাগিরি ক'রে আস্কারা পায়, সেখানে....সব কথা বলিতে পারিলেন না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন।

ব্রজেনবাবু মরিয়া হইয়া প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু উনি যে বৈবাহিক মহাশয়, ওঁর সঙ্গে?—

গৃহিণী জোর দিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গেই হবে। হাজার হোক, উনি ভদ্রলোক; তোমার মত পিণ্ডি গেলার অভ্যেস নেই!

এতটা বলিয়া গৃহিণী কন্যার হাত ধরিয়া হেঁসেলের দিকে চলিয়া গেলেন। অতিথি সৎকারের জন্যই বোধ হয় ওদিকে যাওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল।

ব্রজেনবাবুও ভবিতব্যকে মানিয়া আপন মনেই বলিলেন, "তথাস্তু"। বৈঠকখানায় ফিরিয়া দেখিলেন, আড়ালের পিছনে সকলেই আত্মপিণ্ডি গিলিয়া চলিয়াছেন, ভাবিতে লাগিলেন—নিজের পিণ্ডি নিজে গিলিলে কাহার কপালে কি ঘটে একমাত্র ভাগ্যবিধাতাই জানেন!

ভদ্রলোক

লোকটা একেবারে ছোটলোক হে, বলা নেই কওয়া নেই—হঠাৎ, চাবুক চালান সুরু করে দিল। আমি তেমনি ছেলে কিনা যে একবারের বেশী দুবার চাবুক খাবো! একথা পিঠে যেমন পড়া অমনি ভিড়ের মাঝে বসে পড়লুম। আমার পিছনেই ছিল আকাট ষণ্ডা কেশব, পড়বি তো পড় আমাকে লক্ষ্য করা চাবুক একেবারে কেশবের মুখে। আর যায় কোথায়, লেগে গেল হাতাহাতি! সারজেন্টের সঙ্গে হাতাহাতি! ভেবে দেখো কাণ্ডটা! বোকা কি আর গাছে ফলে? আমার মত বসে পড়লেই পারতো—সব গোল মিটে যেতো। তা না, বাঁদরামী সুরু করে দিল। সারজেন্ট তো কারুর উপর আড়া-আড়ী করে চাবুক মারছিল না, ভিড় তার দিকে তেড়ে আসাতে বাধ্য হয়েই কর্ত্তব্যের খাতিরে এলোধাবাড়ি মার সুরু করেছিল। এলোধাবাড়ি চাবুক চালানোয় যে মজা আছে, তা আমাদের মত শান্ত গোবেচারা লোকে বুঝবে কেমন ক'রে!

উক্ত ভাবে পাড়ার ভজরাম, গত কাল মোহনবাগানের ফুটবল ম্যাচ্ ও তৎসহিত ভিড়ের বিবৃতি দিতেছিল।

গোপাল ঘোষ সায় দিয়া বলিল—যা বলেছ ভাই, বোকা না হলে সারজেন্টের সঙ্গে উপরচালাকি মারতে যায়? এখন মজাটি বোঝ, বাবাজী হাজতে আটক পড়েছেন! অমন ষণ্ডা মার্কা চেহারা করেছিস, দুঘা চাবুকের মারই যদি হজম না করতে পারিস তো ভিড় ঠেলে ম্যাচ দেখতে যাস কেন বাপু! তোমাকে বলব কি ভাই, আমার মত এই শুটকো চেহারা নিয়ে আজ ১০-১৫ বছর ধরে মোহনবাগানের খেলা দেখছি, টীমটা (Team) আমাদের জাতের গৌরব, কি বল ভায়া? অমন টীমের হার জিত, আমাদের ঘরের কথা। এই ম্যাচ দেখার জন্যে চাবুক তো সামান্য কথা, গোরার কত

ভদ্রলোক

বুটের ঠক্কর খেলুম তার গোণাগুন্তি নেই, তবু বাবা, জাতের গৌরবকে আঁকড়ে পড়ে থেকেছি, মোহনবাগানের ম্যাচ দেখা ছাড়ি নি।

ভজরাম উত্তর দিল—বটেই তো, অমন না হ'লে দেশের কাজ হয়, না, দেশের প্রতি দরদ দেখান যায়! কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত ঐ কেশবটা একেবারে টিট না হচ্ছে, ততদিন দেশের ভালমন্দ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। শুধু কি কেশব হে?—ওদের পরিবারটারই ব্যবসা গোঁয়ারতুমি। কেশব হাজতে যাবার কয়দিন আগে, ওদের বাড়ী গিয়েছিলুম কিছু বাদাম সংগ্রহ করতে। উঠানে ঢুকতেই দেখি বকাট কেশব, বড় ভাই বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে কুস্তী লড়ছে। বড় ভাই, গুরুজন-ব্যক্তির প্রতি যদি এতটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা আছে! পা দিয়ে দুচারটে লেঙ্গাই চালিয়ে দিল, তাতে কাজ হোলো না দেখে—বিশ্বাস কর ভাই—আমার সামনেই, বড় ভাই, গুরুস্থানীয় লোকের কাঁধে এমনই চড় কসাল, যে অমন সাজোয়ান পুরুষটা মাটিতে কুপোকাৎ! বেচারা তখন হয়ত চোখে ধুতরো ফুল দেখছিল। ছেড়ে দে, তা না, আছাড় খাওয়া লোকটাকে আবার তেড়ে গিয়ে চেপে ধরল! সে কি ঝটাপাটি ভাই—যেন দুটো বুনো মোষের লড়াই; ভদ্রলোকের ছেলে, ভেবে দেখ কাণ্ডটা! বাবা আখড়ার বাইরে বসে ছিলেন, ছোট ছেলের এই কীর্ত্তি দেখে বলে উঠলেন—সাবাস বেটা, সাবাস ঘরোয়ানা চাল! ভেবে দেখো কাণ্ডটা, বড় ছেলে মার খেয়ে মরছে, তার বাপ ছোট ছেলের তারিফ করছেন! এই ভাবে আস্কারা পেলে, গুণধর ছেলে গোরার সঙ্গে মারামারি করবে না—তুমিই বল, অ্যাঁ?

যখন জাতি-প্রীতি ও পিতার কর্ত্তব্যের আলোচনা লইয়া উভয়েই আত্মহারা হইয়াছিল, সেই সময়ে কেশবের বড় ভাই বীরেশ্বরবাবু, ভজরামের রোয়াকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোন রূপ ভূমিকা না করিয়াই বীরেশ্বরবাবু বলিলেন—ভজরাম বাবু, কেশব আপনাকে সাক্ষী মেনেছে, আপনি নাকি কাল সারজেন্টের সঙ্গে মারামারির সময় উপস্থিত ছিলেন?

কথাটা শুনিয়া ভজরাম একেবারে আকাশ হইতে পড়িল; উত্তর দিল, বলেন কি মশাই, আজ তিন চার বছর থেকে গড়ের মাঠ কি রকম জিনিষ চোখেই দেখি নি! ম্যাচ দেখায় ঐ সব মারামারি হয় বলেই তো অমন একটা সখের জিনিষ ছেড়ে দিয়েছি। এই তো গোপাল ঘোষ বসে আছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন, কাল সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত এগারটা পর্য্যন্ত এইখানে বসে দাবা খেলেছিলুম কিনা। খেতে শুতে রাত হওয়ায় বাড়ীতে তুমুল কাণ্ড বেধে গেল, মেয়েরা একদিকে আর আমি একলা একদিকে, সে হৈ-হৈ ব্যাপার।

গোপাল সমর্থন করিয়া বলিল—সত্যই, কাল ভজরাম কি মাতাটাই না মাতিয়েছিল! এদিকে রাজা সামলাই তো ওদিকে মন্ত্রী মরে, মন্ত্রী সামলাই তো হাতী যায়। এত বুদ্ধি নিয়ে ও যে

কেন হাইকোর্টের জজ্ হ'ল না—তাই আশ্চর্য্যি। বন্ধুর প্রশংসা-বাণী আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকায়, বীরেশ্বরবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—দাবা খেলায় অমন বুদ্ধি লইয়া ও হাইকোর্টের জজ্ না হওয়াতে দেশের ক্ষতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। উপস্থিত আমি জানিতে আসিয়াছি, আপনি কেশবের পক্ষে সাক্ষী দাঁড়াইয়া সত্য ঘটনাটি কি ভাবে বলিবেন।

ভজরাম ঘোষের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে, ঘোষই উত্তর দিল—আপনি না হয় লেখা পড়া করেছেন, প্রফেসার মানুষ, তাইব'লে কি বলতে চান আমাদের মান ইজ্জৎ নেই। ভদ্রলোকের ছেলে কোথায় কি দুষ্কর্ম্ম করে বেড়ায়, তারই সপক্ষে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াতে হবে? আমরা মশাই পাড়ার পুরান বাসিন্দে, মান ইজ্জৎ আছে—আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে পারব না, সোজা কথা বলে দিলুম।

বীরেশ্বরবাবু বলিলেন—তাহলে আপনিও মারামারির খবর রাখেন দেখছি?

গোপাল উত্তর দিল, মারামারির কথা কি ভাবছেন পাড়ায় লুকান আছে? না, এসব কেলেঙ্কারী লুকিয়ে রাখা যায়? লোকে যা তা বলা সুরু করে দিয়েছিল। আমরাই সতঃ পবিত্তি হ'য়ে কতকটা চাপা দিয়েছি; হাজার হোক—আপনার বাবা পেনশন নেয়া সরকারের বড় চাকরে, আপনি হ'লেন প্রফেসার মানুষ, বিজ্ঞ ব্যক্তি; কেশবও আমাদের, কি বলে—দুদিন বাদে ডাক্তার হ'য়ে বেরুবে—আপনাদের সম্বন্ধে কি বলে....

আমাদের নিয়ে আপনারা যে আলোচনা করেন তা আমরা জানি। জানি বলেই তো এলাম কি ভাবে সাক্ষীটা দেবেন বুঝে নেবার জন্যে। আপনারা যখন শুভার্থী তখন আশা করব, মারামারি সম্বন্ধে সত্য ঘটনা আদালতে বলবেন। এতে অনেক ভদ্র-সন্তান অযথা চাবুকের মার থেকে রক্ষা পাবে।

ঘোষ, দৈহিক সান্নিধ্যের বিপদসঙ্কুল কেন্দ্র হইতে একটু পিছাইয়া, জোরে চড়া গলায় বলিল, আপনি বেশ কথা বলছেন মশাই, বেচারা ভালমানুষ ভদ্রলোক, দেখলো না, শুনলো না—আর আপনার ভাই ব'লে আদালতে হলফখেয়ে ডাহা মিছে কথাগুলো বলে আসবে! ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, পথও নোংরা করবে চোখও রাঙ্গাবে, আর আমরা গিয়ে বাঁহবা দিয়ে আসব!

এই কথার পর বীরেশ্বরবাবু আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

জামিনে খালাস পাইয়া কেশব ফিরিয়াছে। ইহাও একটি অস্বস্তিকর ঘটনা। সে নাকি হাজত হইতে খালাস পাইয়াই বার তিনেক ভজরাম ও গোপাল ঘোষের বাড়ী চড়াও হইয়াছিল—কিন্তু দেখা পায় নাই। মেয়েরা দরজা না খুলিয়াই নেপথ্যে জানাইয়াছিল—পুরুষ মানুষ কেহ নাই।

এদিকে কেসের দিন ঘনাইয়া আসিতেছিল, দাদার নিকট সমস্ত ঘটনা শুনিয়া, সত্য কথা বলাইবার জন্য সে নিজে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে ঠিক করিয়াছিল। কিন্তু যাহা ভগবানের অসাধ্য কর্ম্ম তাহা সামান্য কেশব সমাধান করিবে কেমন করিয়া? বিব্রত কেশব ভাবিতে লাগিল,—অযথা চাবুক খাইয়া সারজেন্টের কব্জি সরাইয়া ফেলিয়াছে তাহাতে হইয়াছে কি! হাতের হাড় যদি অতই পল্কা তো ভিড়ের মাঝে অতবড় গুরুদায়িত্ব লইয়া আসে কেন, এবং আত্মরক্ষার উপযুক্ত শক্তি যদি নাই তো চাবুকই বা ব্যবহার করে কেন? আত্মপ্রশ্নে মীমাংসা দাঁড়াইল, বেশ করেছি, মেয়েলি শরীর নিয়ে সারজেন্টগিরি করতে গেলে ঐ রকম সাজাই পেতে হয়। সিদ্ধান্তটি আইনসঙ্গত কি না জানি না, তবে কেশবের নিকট উহাই চরম যুক্তি বলিয়া ধার্য্য হইয়াছিল।

যথাসময় মোকদ্দমা আদালতে উঠিল। সরকারী উকিলের জেরা মোক্ষমে উঠিবার পূর্ব্বেই ভজরাম স্বেচ্ছায় স্বীকার করিল—কেশব একটি বিশিষ্ট গোঁয়ার জাতীয় প্রাণী, পালোয়ানিতে ঘোরতর আকৃষ্ট, তদুপরি আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান অন্যায়ভাবে সজাগ। শেষোক্ত কারণে গুরুজন ও মান্যবর ব্যক্তিকেও প্রহার দিয়া থাকে।

কেশবের জবানবন্দি ও ভজরামের স্বীকারোক্তিতে মিল ঘটিয়া গেল। কেশব বিনাদ্বিধায় সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে ভগবান সাক্ষী রাখিয়া মানিয়া লইল, আত্মমর্য্যাদা রক্ষার্থে আত্ম বিসর্জ্জন দিতেও তাহার বাধে না। অযথা চাবুক খাওয়ার পর সত্যই সে সারজেন্টের কব্জি কুস্তীর প্যাঁচে ধরিয়াছিল, সে ভাবিতে পারে নাই, পুরুষের হাড় অত নরম হইতে পারে। বিপক্ষের উকিল কেশবের সত্যবাদিতার সুবিধা লইয়া জানাইল—ধর্ম্মাবতার, সাহেবের এই মোটা কব্জা যে প্যাঁচে ভাঙ্গিয়া যায় তাহা বিপজ্জনক ভয়ঙ্কর অস্ত্র বলিয়া ধার্য্য হউক—অর্থাৎ হাড় ভাঙ্গিবার ক্ষমতা ও উদ্দেশ্য লইয়া লোকটা ভদ্রবেশে খেলা দেখিতে আসিয়াছিল। স্বপক্ষের উকিল প্রতিবাদ করিয়া আবেদন জানাইল—ধর্ম্মাবতার, একজন চিংড়ী-মাছ-খেকো বাঙালী ঐ রকম একজন সাজোয়ান সারজেন্টের কব্জির হাড় কখন ইচ্ছা করিলেই সরাইতে পারে? হুজুর, আমি এইটুকু জানাইতে চাই, আমার মক্কেলের একটু মাথার দোষ আছে, কখন কি বলে ঠিক নাই। স্বপক্ষের উকিল আর কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না—কেশব বুকটা চিতাইয়া বলিল, নিঃসন্দেহ হইবার সুবিধা দিলে এই আদালত ঘরেই ঐ রকম দুইটি সারজেন্টের কব্জা সে এক সঙ্গে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। তিন দিনের সদুপদেশ সব ফাঁস হইয়া গেল, স্বপক্ষের উকিল একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিরাট বোকা কেশবের দিকে তাকাইয়া রহিল। প্রমাণ দৃঢ় হইতে কেশব দোষী সাব্যস্ত হইল। বিচারে জরিমানাসহ এক সপ্তাহের সশ্রম কারাদণ্ড হইয়া গেল।

কেশবের উকিল তর্কযুদ্ধে হার মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তিনিও তাল ঠুকিয়া উচ্চ আদালতে

আপিলের আবেদন পেশ করিয়া দিলেন। আপিল মঞ্জুর হইতে সময় লাগিল না, কেশব পুনরায় জামিনে খালাস পাইয়া, তখনকার মত নির্দ্দোষের ন্যায় যদৃচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইবার সুবিধা পাইল। ভজরাম ঘটনাটি সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার ভয় কাণ্ডজ্ঞানহীন কেশবকে; সর্ব্বদাই কোন একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য আতঙ্কিত হইয়া থাকে। যে লোক গুরুজনকে মানে না, সামান্য কুস্তীর অজুহাতে বিনাদ্বিধায় বড় ভাইকেই চড় কসাইয়া থাকে ; সাহেব সারজেণ্ট পিটাইয়া নির্লজ্জের মত নিজের দুষ্কীর্ত্তি আদালতে স্বীকার করে, তাহার পক্ষে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিতে কতক্ষণ? বলিলেই হইল—"আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে না? এইবার বোঝ মজাটা!"—তাহার পর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া যদি প্যাঁচে চাপিয়া ধরে তখন করিতেছি কি? জলের তলায় হাঙ্গরে কাটার মত বেমালুম অঙ্গহানি হইয়া যাইবে। ব্যায়ামের বৈজ্ঞানিক নিষ্পেষণ হইতে ছাড়া পাইলে হয়ত দেখিব একদিককার পাঁজরার হাড় পাকস্থলীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। তাহার পর অবশ্য মামলা আছে, ফৌজদারী কেসে বাছাধনকে ঘাগী শৌখিন গুণ্ডা প্রমাণ করাইতে সময় লাগিবে না। তাহার পর শ্রীঘরে ঘানিটানার সুখ ভোগ করিতে হইবে। কেশবের আনুমানিক ঘানিটানার দৃশ্যটিও চিত্তাকর্ষক, কিন্তু সে আচ্ছাকরিয়া জেল খাটিলেও ভজরামের দৈহিক যন্ত্রণাও কমিবে না ও হাসপাতালের খরচও কুলাইবে না। কেশব যেমন তাঁদড় ছেলে, তাহাতে আদালত পাঁজরা-ভাঙ্গার খরচের দাবী মঞ্জুর করিলেও, সে হয়ত বলিয়া বসিবে—'জেলখাটিব সেও ভি আচ্ছা, কিন্তু নিজে হাতে ভাঙ্গা পাঁজরার চিকিৎসার খরচ বহন করিব না!' সব দিক বিবেচনা করিয়া ঠিক করিয়া ফেলিল, এমত অবস্থায় দিন কতক গা ঢাকা দেওয়াই ভাল।

ভজরামের যে রোয়াক সন্ধ্যার পর হইতেই জম্‌জমায়েৎ হইয়া থাকিত, আজকাল তাহা খালি পড়িয়া থাকে, "বিন্তী কাবার" বলিয়া কেহ হুঙ্কার দিয়া ওঠে না, 'কচ্চে বারো'র মহামন্ত্রে পাশার ঘুঁটি চলে না, মোহন বাগানকে তাজহাট ফুটবল ক্লাব গোল ঠুকিয়া দিলেও কেহ উচ্চবাচ্য করে না ; সংক্ষেপে, পাড়াটাই নিঝুম মারিয়া গিয়াছে। দিনের বেলাতেও ভজরাম অথবা গোপাল ঘোষের টিকি দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ মোহন বাগান টীমও উঠিয়া যায় নাই এবং উভয়ের আপিসও যথা নিয়মে চলিতেছে। অধিকন্তু, একটি লোমহর্ষকর ঘটনা খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। খবরটি পঞ্চাশ হাজার টাকার অন্তর্ধান,—ভজরাম ও ঘোষের আপিস হইতে চুরি হইয়াছে,—হেড কেশিয়ার পলাতক। যে খবর ভজরামের মুখ হইতে টাটকা শুনিবার কথা, তাহাই কি না বাসী এবং সংক্ষিপ্তভাবে খবরের কাগজে পড়িতে হইল! বিশুদ্ধ কেচ্ছা তেবাসী হইলে তাহা ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া চলে? এ যেন বচ্‌কান আলোনা তরকারী! এমন একটি রসাল খবর ভজরাম গুম্ করিয়া ফেলিতে, পাড়ায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। পর-চর্চ্চার রস গ্রহণ হইতে যাহারা বঞ্চিত

হইয়াছিল তাহারা সকলেই মনে মনে চটিয়াছিল। খুবই স্বাভাবিক—বুভুক্ষুর নিকট হইতে আহার কাড়িয়া লইলে প্রবঞ্চকের উপর আশীর্ব্বাণী বর্ষণ হইবার কথা নয়।

পর-প্রসঙ্গ-অনুরাগী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ঘটনাগুলি নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিয়া, সিদ্ধান্তে আসিলেন যে ভজরাম ও গোপাল ঘোষ উভয়েই জাত-ছ্যাঁচোড়; উভয়েরই চরিত্র এমন একটি স্তরে নামিয়াছে যে, ভদ্রলোকে তাহা ভাবিলেও পাপের অংশ বহন করিতে হয়। এইরূপ সিদ্ধান্তে আসার যথেষ্ট প্রমাণ ছিল—যথা, "টাকা মারিল আপিসের হেড কেশিয়ার, তাহাতে তোদের লজ্জার কারণ ঘটিল কিসে? নিশ্চয় কোথাও গলদ আছে, তার মানে এই লজ্জার ব্যাপারটা হাসিয়া লঘু করিবার উপায় নাই।" মন্ত্রণা সুরু হইয়া গেল। নেতারা দলবদ্ধ হইয়া মস্তিষ্কচালনা সুরু করিয়া দিলেন—রেজোলিউশনে সাব্যস্ত হইল—সকলেই একান্তমনে পৃথকভাবে অনুসন্ধান না করিলে জীবনযাপন বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়িবে। কয়দিন তাস, পাশার আড্ডা বসে নাই—তাহাতেই প্রাণ আনচান করিতে আরম্ভ করিয়াছে; তাহার উপর কেচ্ছার জটিল গবেষণা বাদ পড়িলে মস্তিষ্কের উপযুক্ত ক্রিয়াই বিফল হইয়া যাইতে পারে। পৃথকভাবে অনুসন্ধানের সহিত একটি অস্থায়ী রকমের বৈঠকের ব্যবস্থা চলিতে লাগিল, কিন্তু কর্পোরেশনের খরচায় অর্থাৎ বিনি পয়সায় আলো কাহারও বারাণ্ডায় সহজলভ্য হইল না—ইহাও একটি রোষের কারণ, যাহার জন্য ভজরাম ও গোপাল ঘোষ পরোক্ষ-ভাবে দায়ী।

সমাজরক্ষণপ্রীতি, বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের এমন ভাবেই স্বধর্ম্মে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিয়া তুলিল, যে চিন্তা ও কার্য্যের যোগাযোগ ঘটিতে সময় লাগিল না। ফলে রোয়াকের স্বত্বাধিকারী ভজরামের অবস্থা বিশেষ করিয়া শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। পাড়ায় তাহার উপরন্তু আয়ের সংস্থান—তেজারতির ব্যবসা প্রায় অচল হইবার উপক্রম হইয়াছে, সুদের তাগাদা দিলে দেনাদার সমীহ করা দূরের কথা, মুখ ঝামটা দিয়া ওঠে—অবান্তর আপিসের ঘটনা উত্থাপন করিয়া, তাহার চরিত্রের উপর কটাক্ষ করিয়া থাকে। প্রতিবাদ করিতে গেলে প্রত্যুত্তরে এমন সব কথা শুনিতে হয় যাহা ভদ্রলোকের উপর অপ্রযোজ্য। সে ভাবিতে থাকে এ কোন্ দেশী আচরণ,—পরোপকার ব্রতে সারাটা জীবন উৎসর্গ করিয়াও একরকমটি ঘটিতেছে কেন! কত রকম দৃষ্টান্ত মনে আসিতে থাকে,—অকৃতজ্ঞদের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়ে। এই তো কয়েক বৎসর আগের কথা—বিমানের সর্ব্বগ্রাসী দৃষ্টি হইতে নৃপেনের সম্পত্তি সে বাঁচায় নাই? শরিকে শরিকে মোকদ্দমার সময় সদুপদেশ ও আর্থিক সাহায্য না করিলে আজ নৃপেন পথের ভিখারী হইয়া যাইত। মোকদ্দমা খাড়া করাইয়া নৃপেনদের ভেদ এমন চড়াইয়া দিয়াছে যে হারজিতের ফলাফল তৃতীয় পুরুষে গিয়া নিষ্পত্তি হইতে পারে। সম্পত্তি লাভ হইলে বংশধররা পায়ের উপর পা রাখিয়া বসিয়া খাইবে—ইহাতে ভজরামের স্বার্থ

নগণ্য, মাত্র কিস্তিবন্দি সুদ। সুদ যথাসময়ে পাইলে আসলের কথা কদাচিৎ সে উত্থাপন করে। এই ভাবে সে কত লোকের উপকার করিয়া আসিতেছে তথাপি তাহারই উপর অত্যাচার! তাহার দৃঢ় ধারণা জন্মাইয়াছে, সবকিছুর জন্য ঐ বখাটে কেশবটা দায়ী; সে তলায় তলায় লোকগুলিকে উস্কাইয়া দিয়াছে। লেখা-পড়া-জানা দুষ্ট বুদ্ধির প্রেরণা সাংঘাতিক ভাবে ফলপ্রদ হইয়া থাকে, সুতরাং বিষে বিষক্ষয় না করিলে পাড়ায় টেকা দায় হইবে। কেশবকে কোন প্রকারে হাত করিতে পারিলে পিলেফাটার আশঙ্কাও থাকিবে না এবং কেশব তাহাকে নেকনজরে দেখে জানিলে বাকপটুদেরও মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে। চিন্তা সহজ হইলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করা কষ্টসাধ্য; কারণ কেশবের সামনে সে দাঁড়াইবে কেমন করিয়া—কেশব যে হাতে মুখে কথা বলে! সামনে দাঁড়াইতে যদি হাত দিয়া কথা বলা সুরু করিয়া দেয়!....ভজরাম বিবেচনা করিয়া দেখিল, সে ঠিক পথে চলিতেছে না; মতলবটা ঘুরাইয়া গোপাল ঘোষকে বলিল, দেখ ভায়া, যে রকম দেখছি তাতে এখান থেকে বাসা না তুলতে হয়। পাড়ার ভদ্রলোকের ব্যবহার দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। সব ছোটলোক হে! টাকা মারা গেল কোম্পানীর, তাতে তাদের এত মাথাব্যথা কেন শুনি! পুলিসের লোক তদন্ত ক'রে আমাদের উপর থেকে এক রকম দৃষ্টি তুলে নিয়েছে, আর তোদের তদন্ত থামে না?

গোপাল ঘোষ উত্তর করিল—আর বল কেন? কথায় বলে, মায়ের চেয়ে যে ভালবাসে তাকে বলে ডাইনী—এরা সব পুরুষ ডাইনী হে....পুরুষ-ডাইনী।

এই দেখনা সেদিন পাচু—আরে আমাদের ভবানীর পিসে—আমার পিছু নিয়ে চায়ের দোকানে গিয়ে উঠল। লোকটা কি ফন্দীবাজ হে!—আমার সামনে গ্যাঁট হয়ে ব'সে তিন চারটে চিংড়ী কাটলেটের হুকুম দিয়ে দিলে, দোষের মধ্যে রসিকতা করে বলেছিলাম আমার জন্যে দুই একটা ব'লে দাও না। লোকটা—বিশ্বাস কর—অম্লান বদনে বললে, কাটলেট তোমার পয়সাতেই খাচ্ছি। আমি অবাক হয়ে যেতে আমার মুখের দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে, ক্যাশ ভাঙ্গার কথা সুরু করে দিলে! যতই আমি চেষ্টা করি বোঝাতে যে দামটা আমি দিচ্ছিনা, ততই সে প্রশ্নমালা গাথতে থাকে। জিজ্ঞাসা করার সে কি ভঙ্গী, ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা, যেন স্পষ্টই বলতে চায় সে আমাকে সন্দেহ করে! ম্যাচ-ফেরতা বন্ধুরা তখন আমাদের কাছা-কাছি এসে বসেছে—ফাঁপরে প'ড়ে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত মেনে নিলুম দামটা আমারই দেয়। দামের ব্যবস্থা ঠিক হ'তে ছোটলোক ক্যাশ ভাঙ্গার কথা থামাল বটে, কিন্তু কাটলেট গুলো একটার পর একটা টুকরো টুকরো করে খেয়ে চললো হে, একবারও বললে না, তুমি একটা খাও! ভেবে দেখ, তখন আমার জিভে জল কাটছিল! লোকটা একেবারে পাষণ্ড, সত্যি কি না তুমিই বল, অ্যাঁ!

ভজরাম উত্তর করিল, তুমি তো কয়েকটা কাটলেট খাইয়েই নিষ্কৃতি পেলে, আমার কপাল কি রকম শোন :—সেদিন নৃপেন ছোকরাটার কাছথেকে আস্কারা পেয়ে, হারাণ বাড়ীচড়াও হয়ে কড়া ভাবে বলে গেল, 'ঢের সুদ গুনেছি, আর দেয়া চলবে না. আসল টাকা যদি চাও তো সুবিধা মত কিস্তিবন্দি করে দিতে পারি ; তা নইলে নালিশ কর গিয়ে, দশ বৎসরে টাকা শোধ হবে।' লোকটার উপকার করতে গিয়ে আমিই যেন মহাপাতক করেছি ! এক সঙ্গে অতগুলো টাকা—আসল দিতে অসুবিধে হয় বলেই, সুদটা নিয়ে নি—ভেবে দেখ কাণ্ডটা—শুধু কি দেনাসম্বন্ধে কড়া কড়া কথা ? আরো বলে কি না—মাত্র আশী টাকা মাইনে পাও, তার থেকে জীবন-বীমার মোটা টাকার প্রিমিয়াম ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের আসলবৃদ্ধি তো আছেই, অধিকন্তু স্যাকরাবাড়ীতে ভারী সোনার গয়নার ফরমাস দেওয়া হয় !—এর গোড়ায় আছে ঐ আপিসের ঘটনা। আমরা সকলেই কচি খোকা নই, সব জানাজানি হয়ে গেছে ! এই টুকু বলে রাখি, আর বেশীদিন তেজারতির কারবার চলবে না ; গণেশ ওল্টালো বলে—নতুন শ্বশুর বাড়ীতে যেতে হবে, প্রস্তুত হয়ে থাক।' শুনলে ছোট লোকের কথা ! আমরা সাতে নেই পাঁচে নেই, ভাল মানুষ, ভদ্রলোক ; আর আমাদের উপর ঐ অত্যাচার ! ভেবে দেখো কাণ্ডটা !

ভজরামকেও কাবু হইতে দেখিয়া গোপাল ঘোষ কেমনতর হইয়া গিয়াছিল। ব্যাকুলভাবে ভজরামের দিকে তাকাইয়া একরকম আত্মসান্ত্বনার জন্যই বলিয়া ফেলিল—আমার মনে হয় দিন কতক বাদে এসব গণ্ডগোল আপনা থেকে থেমে যাবে।

ভজরাম গোপাল ঘোষের মত চিন্তা করে না. সে তলাইয়া দেখিয়াছিল, সুযোগ বুঝিয়া ছোটলোকের দল নিরীহ মানুষের উপর কাঁঠালভাঙ্গা সুরু করিয়াছে ; গাছে পাকা কাঁঠাল ফুরাইলে —এচোড়কেও পিটাইয়া পাকাইবে—শেষপর্য্যন্ত গাছ শুধু ফলশূন্য হইবে না, ডালপালা কাটিয়া জ্বালানি কাঠ করিয়া ফেলিবে—ফলে নিজে পুড়িয়া পরের স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক হইতে হইবে—এতটা বাড়াবাড়ি। দীর্ঘ চিন্তার পর নিষ্কৃতির পথ খুঁজিয়া পাইল—শ্রীঘর-বাস অধিকতর বাঞ্ছনীয় প্রতিপন্ন হইল। রাজদণ্ডে আইনত এক দোষে দুইবার সাজা হয় না। গুছাইয়া স্বীকার করিতে পারিলে, ঘরের মাল অনেকটা টিকিয়া যাইবে—গোপাল ঘোষের কি হইবে না হইবে তাহা ভাবিয়া লাভ নাই ; প্রবাদ বাক্যেই আছে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম—ইহা বিজ্ঞ ব্যক্তির সুচিন্তিত সদুপদেশ। ভজরাম গোপাল ঘোষের স্কন্ধে হাত রাখিয়া, অতিবড় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভূমিকা পত্তন করিল। তাহার পর 'দুর্গে দুর্গতিনাশিনী !' বলিয়া সুরু করিল, "বিপদ থেকে উদ্ধার হবার একমাত্র উপায় দেখছি সব স্বীকার ক'রে দিনকতক ওদিকটা ঘুরে আসা। এতে শাস্তিও কম হবে, আর ঘরের মালও বেশ কিছু টিকে যাবে।"

ভজরাম কাঁধে হাত রাখিতে গোপাল ভাবিয়াছিল কোন একটা উৎসাহবাণীর আশু সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হইয়াছে, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জেল খাটিবার প্রস্তাবে বেচারা একেবারে মুস্‌ড়াইয়া গেল—ভীতভাবে আঁৎকাইয়া বলিল—"বলকি—শেষ পর্য্যন্ত তুমিই জেল খাটার কথা তুলছ!" ভজরাম অবিচলিত ভাবে ভাবিতেছিল সরকারের পক্ষে সাক্ষী হইয়া দোষ স্বীকার করিলে গোপাল ঘোষ ও কেশিয়ারের কপালে যাহাই থাকুক তাহার দণ্ড লঘু হইবেই, তাহার পর জেল হইতে বাহির হইয়া বাকি জীবনটা পায়ের উপর পা রাখিয়া কাটাইয়া দিতে পারিবে। নিষ্কর্ম্ম জীবনের প্রবল আকর্ষণে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। কথায় বলে—বুদ্ধিমানের কার্য্যসিদ্ধি ছলে, বলে, কৌশলে। কৌশলে মানেই তো........। ভজরাম মনে যথেষ্ট বল পাইয়া—কৌশলের কল টিপিয়া দিল—গোপাল ঘোষকে বলিল, ভায়া, তুমি হ'লে আমার বন্ধু লোক, একটু তোমার মনটা পরীক্ষা করে নিলুম। গোপাল ঘোষ ধড়ে প্রাণ ফিরিয়া পাইল—বলিল, তোমাকে জানি বলেই তো টাকা সরিয়ে সবই তোমার কাছে জমা রেখেছিলুম।

ভজরাম বাধা দিয়া বলিল, বেশ আছো ভায়া, আমি সাতে নেই. পাচে নেই, নিরীহ, ভালমানুষ, ভদ্রলোক; আর আমাকে টাকা ভাঙ্গার সঙ্গে জড়াচ্ছ! তুমি বন্ধু লোক, তোমাকে আর কি বলব, ভগবান তোমার ভাল করুন। কেশিয়ার যে টাকা ভেঙ্গেছে তাই স্বীকার করতে চেয়েছিলুম আর তো কিছু না। কেশিয়ার মিছে কথা ব'লে আমাদের জড়িয়ে দিলে—তখন ওদিকটা ঘুরে আসা ছাড়া উপায় কি আছে বল। উক্তিটি শুনিয়া, গোপাল ঘোষ প্রথমটা হতভম্বের মত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পরে উভয়ের মানসিক উত্তেজনায় যে সব বিশেষণের আদান-প্রদান হইয়াছিল তাহার সহিত বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই, বিশেষণগুলিও অত্যাচ্চ ভাবব্যঞ্জক। ভব্যতার খাতিরে উহ্য রাখিলাম।

কিছুদিন বাদের কথা—আবার কাগজে ক্যাশ ভাঙ্গার খবর বাহির হইয়াছে; কেশিয়ার ধরা পড়িয়াছে। তদন্তের ব্যাপারে গোপাল ও ভজরামকে টান পাড়িয়াছে। ভজরাম বুদ্ধিমান লোক, ভাবিল এখন সবদিক না সামলাইলে রক্ষা নাই—সে কেশবের দ্বারস্থ হইল। সব কথা গুছাইয়া বলাই তাহার স্বভাব। বিনীত ভাবে কেশবের সামনে দাঁড়াইয়া যে কয়টি কথা বলিতে পারিয়াছিল তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ—"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট, হে মহান, এখন আমি তোমার কৃপার্থী। রাখিতে চাও রাখ, মারিতে চাও মারো, তোমার জয়গান করাই আমার জীবনধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য—মানুষহিসাবে তোমাকে আদর্শ মনে করি, তথাপি আদালতে যে দুই একটি বেফাঁস কথা বলিয়াছিলাম তাহা ইচ্ছাকৃত নয়—জেরার দমে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। তুমি শিক্ষিত, পাস করা মানুষ, অতএব মহান এবং অন্তর্যামী, সবই বোঝ। আমি বুদ্ধিহীন, নরাধমকে

ক্ষমা কর। দীনকে দয়া করিলে তোমার মঙ্গল হইবে।” স্তুতিবাক্যগুলি সঠিক ভাবে পরের পর সাজাইয়া বলিবার জন্য লিখিয়া বহুবার আবৃত্তি করিয়াছিল—স্মৃতির পরীক্ষায় সে বেশ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল, কিন্তু আরো যাহা বলিবার ছিল তাহা অব্যক্ত রহিয়া গেল—অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্র পড়িল। কেশবের বজ্রবৎ দৃঢ় মুষ্টি সবেগে ও সশব্দে ভজরামের চোখের উপর গিয়া জমিয়া গেল। ঠিক তাহার পরের ঘটনা ভজরামের স্মরণ ছিল না। তবে পাড়ার লোকের নিকট জানাজানি হইয়া গিয়াছিল।

টাকা ভাঙ্গার মোকদ্দমা যেদিন আদালতে উঠিল, সেদিনও ভজরামের চোখে ডাক্তারি পুল্‌টিস বাঁধা।

ভজরাম উপযুক্ত উকীল বাছিয়া লইয়াছিল। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হইয়া গিয়াছে,—উপদেশবাণী কণ্ঠস্থ ও বহুবার উদ্‌গারিত হইবার পর বক্তব্য সায়েস্তা হইয়া গিয়াছিল। জেরা সুরু হইতেই সংযমিত স্বীকারোক্তি ধীরভাবে বলিয়া ফেলিল। যাহা বলিল তাহার সংক্ষিপ্ত অর্থ এইরূপ,—“ধর্ম্মাবতার, আমার পিতা ও পূর্ব্বপুরুষরা বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন—সুতরাং আমি ভদ্রবংশজাত এবং নিজে ভদ্রলোক—অতএব আমার দ্বারা এই জঘন্য অভদ্রোচিত কীর্ত্তি সম্ভব হইতে পারে কেমন করিয়া? তবে যেটুকু আমি সত্য বলিয়া জানি তাহা অস্বীকার করিব না। ধর্ম্মবতার, রাখিতেও আপনি মারিতেও আপনি, ঘটনাগুলি এইরূপ—যে টাকাটা আমার নিকট হইতে বাহির হইয়াছে তাহা গোপাল ঘোষের, আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল। অত টাকা আমি প্রথমে রাখিতে চাই নাই—ভয় পাইয়াছিলাম—হয়ত কোথাও গোল আছে ভাবিয়া। আমার সঙ্কুচিত ভাব দেখিয়া ঘোষ বলিয়াছিল, টাকাটা উহার জমিদার-মামা উইলে দিয়া গিয়াছিলেন—সবে নগদ টাকা এটর্নির বাড়ী হইতে সংগ্রহ হইয়াছে, কয়েক দিন পরেই ব্যাঙ্কে রাখিয়া দিবে। বন্ধুলোক, ভদ্রলোক, চোরাই মাল আমার নিকট গচ্ছিত রাখিতে পারে ভাবিতেও পারি নাই। বুদ্ধির দোষে পরোপকার করিতে গিয়া বিপদে পড়িয়াছি, সত্য কথা বলিলাম; এখন মারিতেও আপনি রাখিতেও আপনি—কেশিয়ার বাবু কি করিয়াছেন না করিয়াছেন, আমি কিছুই জানি না।”

Exhibit-এর প্রমাণসহ ভদ্রলোকের উক্তি এবং উকিলের বাকপটুতায় যে শেষ মীমাংসা দাঁড়াইল, তাহাতে গোপাল ঘোষের দীর্ঘকালের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হইয়া গেল।

ভজরামও বেকসুর খালাস পায় নাই, তবে সংযমিত স্বীকারোক্তি ও নিজের ভাগটা এমন ভাবেই সামলাইয়াছিল যে, শুনা গিয়াছে ওদিকটা ঘুরিয়া আসিয়া, আপিসে ১০টা-৫টা করিতে হয় নাই, পায়ের উপর পা রাখিয়াই তাহার সময় কাটিত। কেশিয়ারকে চিনি না, তাহার কি হইয়াছিল জানিবার স্পৃহা আসে নাই।

চিত্ত চঞ্চল

ভাবিতেছিলাম, চাকরীর তথাকথিত উচ্চমঞ্চ ও তৎসংযুক্ত আয়েশ যদি আমাকে প্রলুব্ধ না করিত। যদি নিজের স্বাধীন মতকে দৃঢ় করিয়া উদ্দেশ্যহীন শিক্ষা-পদ্ধতিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে ছাত্রের দল নিজেদের চিন্তাশক্তিকে অপমান করিত না। শিক্ষার আদর্শকে ভুলিত না—মস্তিষ্কের ক্রিয়াকে যন্ত্রচালিত করিয়া ফেলিত না।

ভাবিতেছিলাম সহরের হুল্লোড়ের বাহিরে বহুদূরে নিবিড় বনানীর সন্নিকটে কোন একটি অখ্যাত পল্লীগ্রামে যদি ছোট্ট একটি কুটির বানাইয়া বসবাস করিতে পারিতাম। কুটীর সংলগ্ন একটি মনোমত চিত্রশালা থাকিত এবং উপযুক্ত ছাত্র ও ছাত্রী পাইতাম, তাহা হইলে শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিত.........ইচ্ছামত কাজ করিয়া পরম শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম—অন্তরে শিল্পী পীড়িত হইত না।......

কিন্তু সহজলব্ধ স্বাচ্ছন্দ্য ও তথাকথিত প্রতিষ্ঠা আমাকে এমনভাবেই সম্মোহিত করিয়াছে যে গদিয়ানির আবেষ্টনীর বাহিরে যাইবার সাহস আমার নাই। ভবিষ্যতে পেন্‌শনলব্ধ নিষ্কর্ম্ম জীবনের জন্য এখন হইতেই প্রস্তুত হইতেছি। অলসতার চরম সাফল্যের জন্য রজকের ন্যায় দিনের পর দিন, ভিন্ন খাতায় ভিন্ন ফাইলে, সময় নাই অসময় নাই, ছাপ মারিয়া চলিয়াছি। আয়ু নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে.........অন্তরে রসিক লাঞ্ছিত হইতেছে। যশোলোলুপ অর্থলোলুপ শিল্পী—অবিরত অন্তর্জ্বালায় পুড়িতেছে।

কোন সময় মন-দগ্ধকারী চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। আমি হয়ত ভস্মস্তূপের বাহিরে বিক্ষিপ্ত একটি অঙ্গারখণ্ডের ন্যায় পড়িয়া থাকিব,.........কেহ ফিরিয়া দেখিবে না। চিতা নির্ব্বাপিত হইবার পর শেষ-ক্রিয়ার জলার্ঘ্যের একটি বিন্দুও আমাকে স্পর্শ করিবে না। আমার বহিরাকৃতি ভস্মাবৃত হইলেও উত্তপ্ত অগ্নি ভিতরে থাকিয়া যাইবে। অগ্নির সৃষ্টি ও ধ্বংসের শক্তি লইয়া আমি কি করিব?.......

মনশ্চক্ষে দেখিলাম ঘূর্ণ্যমান বায়ু আসিয়া নিষ্প্রভ অগ্নির ভস্মাবরণ উন্মুক্ত করিয়া দিল। ইন্ধনপ্রাপ্ত অগ্নি প্রাণবান হইয়া উঠিল। অন্তর্লোক হইতে অভয়বাণী শুনিলাম—"তুমি বাঁচিবে—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লইয়াই বাঁচিবে। তোমার অগ্নি নির্ব্বাণোন্মুখ চিতার ধূমকুণ্ডলী নহে। তুমি যে আগুনে জ্বলিতেছ তাহা সৃষ্টির প্রেরণায় পূর্ণ। উপযুক্তভাবে রসসৃষ্টির সুযোগ না পাইয়া তুমি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছ। তোমাকে বাঁচিতে হইবে,.......শুধু নিজের জন্য নয়। যে সব শিক্ষার্থী

তোমার কৃপার অপেক্ষায় রহিয়াছে, তাহাদের বুভুক্ষু মনকে উপযুক্ত অন্নদানে পুষ্ট ও সুস্থ করিয়া তুলিতে হইবে। তোমার দানের কীর্ত্তি সুদূর ভবিষ্যতেও নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করিবে।

"অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেভাবে বায়ুকে বাহন করিয়া দিকে দিকে উড়িয়া যায় এবং যেখানে সামান্য জ্বলন্ত টুকরা পড়ে সেইখানেই আগুন লাগাইয়া দেয়, সেইভাবে তোমার ছাত্রমণ্ডলী দেশে দেশে সুপ্ত রসিকদের জাগ্রত করিয়া তুলিবে। তাহারা রসগ্রাহী হইয়া উঠিবে। রসভোগের পূর্ণতায় তাহাদের জীবন সার্থক হইবে। তোমার কর্ম্মশক্তি নির্ভরশীল, তোমার সাধনায় ভ্যাজাল নাই। এখন তুমি ধৈর্য্যের পরীক্ষার ভিতর দিয়া চলিয়াছ....সুতরাং দুর্ব্বলতাকে দূরে সরাইয়া রাখ। তোমার মনের অবস্থা কতকটা চিতা হইতে বিক্ষিপ্ত অঙ্গার-কণার মত ভস্মে আবৃত রহিয়াছে। উহা আবরণ মুক্ত হইলেই জ্বলিয়া উঠিবে। তুমিও উপযুক্ত রসগ্রাহী পাইলে যশ ও প্রতিষ্ঠাকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না। যথাসময়ে যশের লালসা তোমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিবে। আগুনের ধর্ম্ম নিজে জ্বলা এবং উহার সংস্পর্শে যাহা কিছু আসে তাহাকে জ্বালাইয়া দেওয়া। তুমি যে শক্তি লইয়া জন্মিয়াছ, তাহা শান্তিভোগের জন্য নহে; উহা সারাটা জীবন তোমাকে তিলে তিলে পুড়াইবে, কিন্তু তুমি মরিবে না। শান্তি ও আনন্দের আশায় প্রতিনিয়ত তুমি নূতনের সন্ধানে ঘুরিবে, হয়ত কোন সময় কাম্য যাহা তাহা পাইবে। পাওয়ার আনন্দ ক্ষণিকের জন্য তোমাকে বিভোর করিয়া দিবে, কিন্তু পুনরায় নূতন তোমাকে আকর্ষণ করিবে। তখন যাহা পাইয়াছ তাহাকেই হয়ত নূতন রূপ দিবার চেষ্টা করিবে, অথবা পাওয়াকে পরিত্যাগ করিবে। শক্তিমানের যশোলিপ্সা তাহার কর্ম্মের সহিত জড়িত, আগুনের উত্তাপের মত। যেরূপ আগুন থাকিলেই তাহার উত্তাপকে মানিতে হয়, সেইরূপ তুমি যে শক্তি লইয়া জন্মিয়াছ, তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্মকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং শক্তিকে বিশ্বাস করিলে তাহার স্বাভাবিক প্রেরণাকেও মানিতে হইবে।"

........হঠাৎ মশার কামড়ে বাস্তবে আসিয়া পড়িলাম।.......রাত্রি হইয়া গিয়াছে। আমি একেলা বসিয়া আছি, বিদ্যালয়ের তরুবেষ্টিত বৃহৎ প্রাঙ্গণে। শত শত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আজ কেহ আমার সহিত দেখা করে নাই—তাহারা আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে ধর্ম্মঘটের অজুহাতে। আমার সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও অধ্যক্ষকে তাহারা ভিন্ন মানুষ সাব্যস্ত করিয়াছে। ছেলেমেয়েদের প্রতি অভিমান আসিল। তবে কি আমি কেহই নই? মাসিক মাহিনায় পুষ্ট মাত্র একজন কর্ম্মচারী? ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমি কত স্বার্থই না ত্যাগ করিয়াছি। উহাদের খুসী করিতে গিয়া উপরআলার অসন্তুষ্টির কারণ হইয়াছি। এই ত্যাগের বিনিময়ে আমি কি পাইলাম? সাময়িক উচ্ছ্বাসের উৎকট বিচারে আমি সাব্যস্ত হইলাম তাহাদের পর! আমাকে ছাড়িয়া

হইতেছে তাহাতে হাতের নাগালের বাহিরে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। সে ভাবিল, সাহেব এইখানেই খাইবেন?—অর্থাৎ কখন খাইবেন ঠিক নাই। ইতস্তত করিয়া বলিল, নূতন waiter বহাল হইয়াছে, তাহাকে সময়মত ছুটি না দিলে,……বুঝিলাম আমি মুনিব হইলেও নির্দ্দিষ্ট সময়ের বাহিরে আমার প্রভুত্বের দাবী চলিবে না। মনে পড়িল কবির পুরাতন ভৃত্যের কথা। তাহারা চাকরী করিতে আসিয়া পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইত; প্রভুর জন্য যে কোন স্বার্থত্যাগে তাহাদের কখন দ্বিধা আসিত না। আমাদের বাড়ীতে দেখিয়াছি, কৈশোর আসিয়া উপস্থিত হইতেই, ময়না—যোগিয়া—পরাণ, সম্বোধনের "ছোট খোকা", "বড় খোকা" ডাক ছাড়িয়া হুজুর বলিতে আরম্ভ করিলেও, দুষ্কর্ম করিলে অভিভাবকের মত শাসনের ভাষায় আদেশ করিয়াছে। অসুস্থ হইলে স্বেচ্ছায় সারাটা রাত বিছানার পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিয়াছে। উপরি খাটুনীর জন্য স্নেহ ছাড়া, অধিকন্তু কিছু তো দাবী করে নাই। কালের পরিবর্ত্তনে যে নূতন চেতনা আসিয়াছে তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাট্‌লারের বিনীত আদেশ মানিলাম।

….আহারান্তে বাংলোর প্রশস্ত বাঁধানো চাতালে আসিয়া বসিয়াছি। পিছন হইতে নানারূপ আড়ালের পাশ কাটাইয়া ঝাপ্‌সা বৈদ্যুতিক আলোর ক্ষীণ রশ্মি আমার সামনে আসিয়া পড়িয়াছে। হাওয়া নাই, প্রাঙ্গণের গাছগুলির একটি পাতাও নড়িতেছে না। সাংঘাতিক গুমোটের মধ্যে বসিয়া আছি। অকস্মাৎ আকাশে দূরে বিদ্যুতের লেলিহানরূপদেখিলাম। ভাবিতে লাগিলাম হয়ত এই স্তব্ধতার পিছনে বিরাট আলোড়নের আয়োজন চলিয়াছে।….

প্রশ্ন উঠিল—কেন?….যে সূত্র হইতে পূর্ব্বে অভয়বাণী শুনিয়াছিলাম তথা হইতে গুরুগম্ভীর নিনাদে অদৃশ্য ব্যক্তি সবাক হইয়া উঠিল। আকাশ ক্ষণে ক্ষণে মেঘগর্জ্জনে যেন ভূমিকে পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিতেছিল। বুঝিলাম, প্রকৃতি ধ্বংসের লীলার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পরক্ষণেই মনে হইল অজ্ঞাত লোক হইতে কেহআমাকে বলিতেছে—"অজ্ঞ! মানবের পাশবিক মনোবৃত্তিকে জানিবার জন্য প্রস্তুত হও, সময় 'আসিয়াছে।….প্রশ্ন করিয়াছিলে—প্রকৃতির স্তব্ধরূপ দেখিয়া ভীত হইতেছি কেন?….উহা অশান্ত প্রকৃতির ভয়ঙ্কর আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বাভাস।….ধ্বংসের আয়োজন চলিয়াছে। সৃষ্টি ও ধ্বংসের উৎপত্তি একই সূত্র হইতে, কিন্তু উহাদের ধর্ম্ম ভিন্ন। যে শক্তি তোমাকে সৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছিল এবং যে প্রেরণার পূর্ণ প্রকাশ হইতে পারে নাই, তাহারই অতৃপ্ততা তোমাকে ব্যভিচারিতার দিকে লইয়া চলিয়াছে। তোমার অন্তরের পশু জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। তুমি আত্মপ্রতারক ও কামোন্মত্ত। লালসার জীবন্ত প্রতীক। তুমি শক্তিমান ও ভোগী। ভোগ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছ। নীতিবদ্ধ সংস্কার তোমাকে বশ্যতা স্বীকার করাইয়াছে। এই বশ্যতাকে সংযম ভাবিয়া নিজের চারিত্রিক আদর্শকে এমন একটি উর্দ্ধলোকে তুলিবার চেষ্টা করিয়াছ,

যাহা প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম মানিতে পারে নাই। প্রাকৃতিক শক্তিকে বাধা দিতে কেহ পারে না। তাহার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম, শক্তি। এই শক্তি অধিকমাত্রায় পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিলে যেমন বিস্তৃত জলরাশি বাধার দুর্ব্বল স্থানটি খুঁজিয়া লয় এবং অধোগতির জন্য বেগে ধাবিত হইতে থাকে—বন্যায় শ্যামল ও শান্ত গ্রামকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ তোমার পুঞ্জীভূত অতৃপ্ত শক্তিও নীতির বাধন ছিঁড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে—নিজের অজ্ঞাতেই কখন দেখিবে তুমি নীতির বাঁধন হইতে মুক্ত—অধোগতির জন্য মুক্ত।

"জলের কথা বলিয়াছি, অগ্নির কথা বলি। মূর্খ, ইহাও কি জান না, আগ্নেয়গিরি দীর্ঘকাল নির্ব্বাপিত হইলেও, তাহার গহ্বরে অদৃশ্য স্থানে অনেক সময় আগুন থাকিয়া যায়? অগ্নির বাহ্যিক প্রকাশ তখনই দৃশ্য হয়, যখন অন্তর্নিহিত পুঞ্জীভূত অসীম শক্তিকে পাহাড় আর ধরিয়া রাখিতে পারে না। হঠাৎ বিস্ফোরণে গলিত ধাতু বাহির হইয়া আসে এবং পাহাড়ের দেহকে জড়াইয়া ধরে—বহিরাকৃতিকে পোড়াইয়া দেয়—বনানী ভস্মে পরিণত হয়।....মানব পশু।....তোমাকে সাবধান করিয়া দিতে আসি নাই, শুধু জানাইতে চাই, অশান্ত মুহূর্ত্তে দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া অকস্মাৎ যখন নীতির সব বাধন, সব সংযম কামের প্রবল শক্তি ছিঁড়িয়া ফেলিবে, যখন তুমি লালসার পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিবে, তখন তোমার অবস্থা কি হইবে? তুমি রসসৃষ্টির কথা ভুলিবে, মনের সুস্থতা হারাইবে।....অন্তরের সুযোগ সন্ধানী মহাশক্তিমান দানব তোমাকে পাতালের অতল গহ্বরে ফেলিয়া দিবে। গাঢ় অন্ধকারের দৃঢ়চাপে তুমি দৃষ্টিহীন হইয়া যাইবে। বধিরতা শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিকল করিয়া দিবে। সহজ নিঃশ্বাসের জন্য খোলা বাতাস খুঁজিবে—শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে—কিন্তু তুমি মরিবে না—ভোগের চূড়ান্ত ফলের জন্য বাচিবে। ঘৃণ্য ব্যাধিতে তোমার মাংস গলিত কুষ্ঠের ন্যায় হইয়া যাইবে, ঠিক আগ্নেয়-গিরি হইতে নির্গত গলিত লাভার মত। অসহ্য যন্ত্রণায় তুমি মৃতপ্রায় হইয়া থাকিবে, কিন্তু মরিবে না। জঘন্য ভোগের পূর্ণতৃপ্তির চরম পরিণাম কি হইতে পারে, তাহারই দৃষ্টান্ত প্রমাণের জন্য তুমি বাচিবে। তোমার সান্নিধ্য মানুষের নিকট ভীতিপ্রদ ও ঘৃণ্য হইয়া উঠিবে।"

........ঢং—ঢং—ঢং !! করিয়া নিকটবর্ত্তী গীর্জ্জার ঘড়ি বাজিয়া চলিল—মধ্যরাত্রির সঙ্কেত। সময় ও আবেষ্টনীর কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কোলাহলময় সহর নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। জাগিয়া আছি আমি, আর হয়ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কেহ।....প্রতিটি ঘণ্টায় একটু করিয়া আয়ু শেষ হইয়া যাইতেছে,....আমরা পলে পলে মরিতেছি।

ঝিমাইয়া আসিতেছিলাম....উঠিয়া বসিলাম।....দেখিলাম পার্শ্বেই খর্ব্ব পীঠিকায় সুরার ডিক্যাণ্টার এবং হাতের নাগালেই শূন্য কাচের পানীয় পাত্র।....বেশ খানিকটা ঢালিয়া ফেলিলাম।

পিছন হইতে ক্ষীণ আলোকরশ্মি সুরাপূর্ণ স্বচ্ছ আধার ভেদ করিয়া বিপরীত দিকে আসিয়া পড়িতেছিল। মনে পড়িয়া গেল গোক্ষুরা বিষধরের জ্বলন্ত দৃষ্টির কথা। আলো পড়িলে বিষধরের চক্ষু এইভাবেই জ্বলে বটে।....সুরা ও গরলে পার্থক্য অপসারিত হইল....বিষপান করিলাম। এক নিঃশ্বাসে হলাহল অনেকটাই গলাধঃকরণ করিয়াছিলাম। অল্পক্ষণের ভিতরই সুরার প্রভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে হইল, পৈশাচিক শক্তি আসন্ন প্রলয়ের জন্য আমাকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিতেছে। সুরার ক্রিয়া সুরু হইয়াছে, ধীরে ধীরে নরকের অন্ধকারময় গভীরতায় তলাইয়া যাইতেছি।

....কিছুক্ষণ পরেই অন্ধকার অপসারিত হইয়া গেল—অলৌকিক আলোকে বিরাট রাজপ্রাসাদ ধৌত হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—আবেষ্টনী রহস্যময় হইয়া উঠিল—সুপ্রশস্ত পাথরের প্রাঙ্গণে আমি উচ্চ আসনে আসীন। বিশিষ্ট অভ্যাগতের স্থান অধিকার করিয়াছি।

....শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি থামিয়া গিয়াছে। ক্ষণিকের স্তব্ধতা, পরক্ষণেই মেঘগর্জ্জনের মত মৃদঙ্গ ধ্বনিত হইয়া উঠিল—গম্ভীর সুরে মেঘ রাগ সুরু হইল।....রুদ্রবীণ বাজিতেছে, যেন প্রলয় ও মহাকাল অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে।....সুর সুরু হইল। ভাবিয়াছিলাম তাণ্ডব নৃত্যের আশু সূচনা, কিন্তু আসিল নারী—নটী ও তন্বী। সুর ধিমায় বাজিয়া যাইতেছিল, সাম্ আসিতেই নারীর স্তনাগ্রচূড়া প্রথমে নাচিয়া উঠিল। পীনস্তনদ্বয়ের অপূর্ব্ব নৃত্যকৌশলে মুগ্ধ হইলাম—মুহূর্ত্তে লজ্জা ও সঙ্কোচকে শাসন করিয়া ফেলিলাম—নির্ভীকভাবে নারীর গঠন-সৌন্দর্য্য সম্মোহিতের ন্যায় দেখিতে লাগিলাম। তন্বীর ঊর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত—অপরার্দ্ধ শুভ্র ও স্বচ্ছ বস্ত্রে আবৃত। বস্ত্রের আড়াল থাকা সত্ত্বেও নটীর দেহ-গঠনের অস্পষ্ট আভাস দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছে—চোখ ফিরাইবার উপায় নাই, চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

....নৃত্য সুরু হইল। দেখিতে লাগিলাম নারীর দেহগঠন ও তাহার লীলায়িত দোলা। সুর, তাল ও নূপুরের ধ্বনির অপূর্ব্ব যোগাযোগ। ভাবিতে লাগিলাম—আমি এই নারীদেহ স্পর্শ করি নাই! উত্তেজনায় আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম, অনুভব করিলাম পিশাচ আমার অতি নিকটে আসিয়াছে। অনুভূতিতে সন্দেহ করিবার কিছু ছিল না। পিশাচ কানের কাছে চুপি চুপি পরামর্শ দিল—'ভোগী! সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে, আমাদের রাজার আদেশে তোমার অতৃপ্ত বাসনার পূর্ণ হইবে—পাতালের পাষাণ পুরীতে। আজ যে সুযোগ পাইয়াছ তাহা আর জীবনে হয়তো পাইবে না........প্রস্তুত?' নারীর অসাধারণ গঠনসৌন্দর্য্য আমাকে সম্মোহিত করিয়া ফেলিয়াছিল—বলিলাম, পিশাচ, আমি প্রস্তুত, পথ দেখাইয়া দাও। পিশাচ তর্জ্জনীর দ্বারা পথ নির্দ্দেশ করিল এবং বলিল, নৃত্যের পরেই নটী তোমাকে অনুধাবন করিবে।....দেহ স্পর্শানুভূতির কামনা

তখন অসম্বরণীয় হইয়া উঠিয়াছে, আমি নিজে শিল্পী, তথাপি নৃত্যের কলাপ্রভাবের কথা ভুলিয়াছি। দেহের দোলা দেখিয়া মনে যে চঞ্চলতা আসিয়াছে তাহার সহিত কলাচর্চ্চার কোন সম্বন্ধ নাই। কামাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে—নারীর সর্ব্ব অঙ্গ প্রাণ ভরিয়া স্পর্শ করিবার জন্য। নিজেকে ধিক্কার দিতেছি সারাটা জীবন কি-ভাবে আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়াছি বলিয়া। অন্তর্যামী পিশাচ আরো নিকটে আসিয়া আরো চুপি চুপি বলিল—"সত্যই তুমি আত্মপ্রতারণা করিয়াছ। ইহাতে তোমার দোষ নাই—উহা সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রতিক্রিয়া। সমাজের শৃঙ্খলার জন্য যে চারিত্রিক আদর্শ তোমাকে ও অপরকে শাসন করিতেছে, তাহা সকলের পক্ষে মানিয়া লওয়া সহজসাধ্য নয়। সাধনার দ্বারা কেহ কেহ দেবতার আসনে নিজেকে অধিষ্ঠিত করিলেও প্রমাণ হয় না, সকল মানুষই দেবতা; এবং সকল মানুষই যদি দেবতা হইবার চেষ্টা করে, তবে মানবজন্মের সার্থকতা কোথায়? সভ্যতার ধ্বজা উড়াইয়া যতই মনকে উর্দ্ধস্তরে তুলিবার প্রয়াস থাকুক না কেন, সুস্থ দেহ ও মনের প্রকৃতিদত্ত উচ্ছ্বাসগুলিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা বাতুলতা। তুমি বাতুল নও, কারণ ভোগলিপ্সা তুমি জন্মগত দাবী বলিয়া মানিয়াছ। ভোগী, আর বিলম্ব করিও না—সংস্কারের শৃঙ্খল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া ফেল।"....পিশাচের যুক্তি বিজয়ী হইয়া উঠিল। আমি চলিলাম পাতালের পাষাণ পুরীর দিকে।

...প্রাসাদের তোরণ দ্বারের নিকটে আসিতেই চিরপরিচিত সঙ্কোচের সান্ত্রীপাহারা দ্বারপথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সফল হয় নাই। কাম প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা আমার সর্ব্বাঙ্গে জ্বলিতেছিল; সে অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্বারী দ্বার ছাড়িয়া দিল। প্রাসাদাভ্যন্তরে কত কক্ষ, কত দ্বার, অতিক্রম করিলাম মনে নাই। আলো নাই, তথাপি চলায় কোন বিঘ্ন ঘটিতেছে না। যতই চলিতেছি, ততই অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতেছে। নৃত্যের আসর কতদূরে ফেলিয়া আসিয়াছি বলিতে পারি না। তবে যেখানে আসিয়া পড়িয়াছি, সেখানে নিস্তব্ধতা—অন্ধকার, এবং চতুষ্পার্শ্বে পাষাণের স্থাপত্য ভিন্ন আর কিছু নাই। হঠাৎ শুনিলাম ক্ষীণ বংশীধ্বনি—সাপুড়ের সুরের মত বাজিতেছে। ঘোর অন্ধকারের মাঝে সাপের সহিত কে খেলিতেছে? কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। পরক্ষণেই মনে হইল বংশীবাদক আমারই দিকে চলিয়া আসিতেছে। আমি দাঁড়াইলাম—বাদক পিশাচ। সে বলিল—বাম দিকের ঘরে চলিয়া যাও, নটী তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। নির্দ্দেশমত বামদিকে ফিরিলাম। দুই একটি পদ অগ্রসর হইতেই নৃত্যসভার মতোই আলো দেখিলাম, যাহার সহিত বাস্তবের জ্ঞাত আলোকের মিল নাই। মাদকতাপূর্ণ অজানা গন্ধে মন অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। আরো একটু অগ্রসর হইতেই সুসজ্জিত কক্ষের ভিতর আসিয়া পড়িলাম।....মশালের মত অতি বৃহৎ প্রদীপ

জ্বলিতেছে, ঘরের একটি কোণে বৃহৎ পালঙ্ক—দুগ্ধফেননিভ নরম শয্যায় সজ্জিত। আবার নিকটেই বাঁশী বাজিয়া উঠিল—তাহার পর শুনিলাম সেই নূপুরধ্বনি! নৃত্যের তালে বাজিতেছে না, নারী গতিশীলা; নূপুরধ্বনি ক্রমান্বয়ে নিকটে আসিতে লাগিল। মনে পড়িল নটীর পূর্ণ দেহ গঠনের কথা, মনে পড়িল হরিণাক্ষীর অর্দ্ধনিমীলিত ইঙ্গিতপূর্ণ চাহনি।....নারী একেবারে নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। আমাদের দৈহিক ব্যবধান তিরোহিত হইতে আর কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র বাকী। বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল, সর্ব্বদেহ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কোন অদৃশ্য ব্যক্তি ঘরে ঘরে বহু প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়াছে, ঘর আলোর বন্যায় প্লাবিত। পিছন দিকে বামাকণ্ঠের মৃদু হাসির শব্দ শুনিলাম। ফিরিয়া দেখি নটী দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়াছে, ...সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা। উজ্জ্বল আলো তন্বীর প্রতিটি অঙ্গ নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়াছে। নারী পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রতিটি পদবিক্ষেপে ঋজুদেহ নাগিনীর মত দুলিতেছে। সর্পিণী যে ভাবে শিকার ধরিবার জন্য মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়, নটীর গতিও সেইরূপ মন্থর ও লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট। অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইবার উপায় নাই। নারীর এই নির্লজ্জ আচরণে আমার মন ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল—বস্ত্রের আড়াল হইতে নৃত্যশীলার যে গঠন আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সেই গঠনই আবরণচ্যুত হওয়ায় বিসদৃশ হইয়াছে! যাহার সান্নিধ্যের জন্য অল্পকাল আগেই মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম—তাহাকেই অতি নিকটে পাইয়া মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ভাবিলাম, এই ভয়াল নাগিনীর বিষাক্ত চুম্বন হইতে ত্রাণ করিবার জন্য কেহ কি অগ্রসর হইয়া আসিবে না? প্রশ্ন উঠিল—ভীতির কারণ কি?....নিজেই প্রশ্নের সমাধান করিলাম। যে আনন্দের জন্য আমি আত্মহারা হইয়াছি তাহা ক্ষণিকের। কিন্তু প্রতিক্রিয়া সারাটি জীবন ধরিয়া চলিবে, যাহার বর্ণনা পিশাচ ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছে। ইহা ছাড়া, আজীবন যে সংস্কারকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়াছি, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস আমার নাই।

পিশাচ আসিল, যুক্তির ধারাল অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া। বলিল—তোমার মাতা, ভগ্নী, বধূ ও নটীর কামোচ্ছ্বাসে প্রভেদ কোথায়? নটীর সহিত যদি কিছু প্রভেদ থাকে তো তাহা প্রকাশ-ভঙ্গীর। তুমি বলিবে, 'নটীর অন্তর শুষ্ক কাষ্ঠের মত হইয়া গিয়াছে—উহার রস-নিবেদনে প্রাণের সাড়া নাই—সব কিছুই সাজান—প্রেমোচ্ছ্বাস আত্মপ্রসূত নহে; পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত থাকে—যন্ত্রচালিতের মত। তদুপরি যে নারী লজ্জাকে বিসর্জ্জন দিতে পারে—যাহার দেহ অত্যন্ত সহজলভ্য, যাহাকে যে-কেহ অর্থের বিনিময়ে পাইতে পারে, সেই নারীকে ভোগের স্পৃহা আমার আসে না।'....পিশাচ মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল—"দুর্লভ নয় বলিয়া যদি প্রত্যাখ্যান করিবার যথেষ্ট কারণ হইয়া থাকে, তবে তো অসংখ্য বিবাহিতা স্ত্রীকেও পরিত্যাগ করিতে হয়। এদেশে দুগ্ধবতী গাভী অপেক্ষা ধর্ম্মপত্নী

অধিকতর সহজলভ্য। তুমি কি বলিতে চাও, প্রতি সংসারে দাম্পত্য জীবনে স্বামীস্ত্রীর যৌনসম্বন্ধ উভয়ের আত্মপ্রতিদানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? অনুসন্ধান করিলে দেখিবে, অধিকাংশ স্থলে বিবাহিত জীবনে স্বামীস্ত্রীর মাঝে নানাবিষয়ে তীব্র মতভেদ গড়িয়া উঠিয়াছে, কামের পূর্ণ প্রকাশ হয় নাই বলিয়া। হয় স্বামী স্থবির, অথবা স্ত্রীকে স্বামী বলপ্রয়োগে ভোগ করিয়া আসিতেছে। এখানেও তো মনের সাড়া নাই—নারী পতিকে দেহ দান করিতেছে সাংস্কারিক ধর্ম্ম ও আইনের তাড়নায়। বারবণিতা ও এইজাতীয় কুলবধূর দেহদানের প্রেরণা আসিয়াছে তাড়নার ফলে—একই সূত্র হইতে। একজন ক্ষুধা ও দৈহিক রূপের প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে সমর্পণ করিয়াছে, অপরে সমাজনীতির কঠোর নির্য্যাতনে লম্পট স্বামীকে দেবতা বানাইয়া পতিপূজার পুণ্য অর্জ্জন করিতেছে। উভয়ের দেহই সহজলভ্য। সংস্কারবদ্ধ না হইয়া যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার কর, দেখিবে যে-কোন প্রকারের ভোগকেই দাম দিয়া কিনিতে হয়।....ক্রেতা কোনসময় অগ্রিম মূল্য দিয়া প্রাপ্তকে যাচাই করে, কোনসময় প্রাপ্তির পর দাম খতাইয়া থাকে।....সুতরাং বারবণিতাকে ঘৃণিতা ভাবিবার তোমার অধিকার নাই। তাহাকে কৃপা করা উচিত। দেহপশারিণীরা আমার মতে হতভাগিনী। তোমাদের উচ্চ চারিত্রিক নিদর্শনস্বরূপ উহাদেরও হয়ত কোনসময় কতকবিষয়ে সূক্ষ্ম প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু জীবিকা উপার্জ্জনের প্রকরণে যেসব পুরুষের সহিত সহবাস করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহারা ক্ষণিকের অতিথি—হয়ত দূরান্তরের যাত্রী। অল্পক্ষণের ভিতর ভোগীকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া তাহাকে যেসব পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তাহা মানি ভালবাসার ভান। কিন্তু ভানেরও প্রয়োজন আছে। ভান করিতে জানে বলিয়াই আকর্ষণ প্রবল হইয়া উঠে এবং অল্প সময়ের ভিতর তাহা ফলপ্রদও হয়। এই কৃত্রিম প্রেমনিবেদন যদি কুলবধূরা উপযুক্ত সময়ে ব্যবহার করিতে শিখিত, যদি লজ্জার আবরণ টানিয়া নির্লজ্জতাকে সরস করিয়া তুলিত; যদি নিজেদের দেবীর উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত না করিয়া মানবীর অস্তিত্বে সন্তুষ্ট থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে—পারিবারিক জীবনযাত্রায় নানা অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটিত না। মূর্খ, আবার বলি, কামের সুস্থ ও সহজ উচ্ছ্বাসকে ছোট করিয়া দেখিও না। তোমাদের শাস্ত্রেই আদর্শ পত্নীর যে কয়টি গুণ-ব্যাখ্যা আছে, তাহাতে শয়নে বেশ্যার ক্রিয়াকলাপ অনুকরণের কোন উল্লেখ নাই কি?"

আমি উত্তর করিলাম—যে-অভিজ্ঞতা সংগ্রহের জন্য একাধিক পুরুষের অঙ্কশায়িনী হইতে হয় তাহাকে আমি বলিব জঘন্য রসকলা। পিশাচ অবজ্ঞার হাসি দ্বারা আমাকে পুনরায় আক্রমণ করিল—যুক্তি টানিয়া আনিল এই বলিয়া—তুমি সংস্কারবদ্ধ, মন তোমার এখনও ভয়াতুর রহিয়াছে। আমি বলিলাম—বাস্তবিকই আমি সংস্কারকে ভয় করি। কারণ, আমি জানি সংস্কারের কড়া শাসন না থাকিলে, ব্যক্তিগতভাবে মানুষ ব্যভিচারিতার প্রশ্রয় দিয়া, সমাজে বিশৃঙ্খলতা ব্যাপক-

ভাবে প্রচার করিবে।........পিশাচ আর আসিল না। বুঝিলাম তার যুক্তির অস্ত্রে ধার কমিয়া আসিতেছে। মনে বল পাইলাম।......

হঠাৎ শুনিলাম পিশাচের দীর্ঘনিঃশ্বাস, পিশাচের ব্যর্থতার সঙ্কেত। অল্পক্ষণ পর অনুমান করিলাম পিশাচ আমার নিকট হইতে দূরে,—বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে এবং দূর হইতে বলিতেছে—ভোগী, লালসার তৃপ্তির যদি সাহস নাই, তবে আমাকে আহ্বান করিলে কেন? তোমার কি জানা ছিল না যে, শুচিতাকে কলুষিত করাই আমার ধর্ম্ম—ধ্বংসের সহায়তাই আমার অস্তিত্বের অবলম্বন? পিশাচের রব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইতেছিল। আমার চিত্তের চঞ্চলতা শান্ত হইয়া আসিতেছিল। শীতল বায়ুর স্পর্শানুভূতি পাইতেছিলাম, পাখীর কলরবে চক্ষু উন্মীলিত করিলাম, দেখিলাম বাঁধানো চাতালেই বসিয়া আছি। ভোর হইয়া গিয়াছে, মধুর পুষ্পগন্ধে আবেষ্টনীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শিশিরসিক্ত পল্লবপ্রান্তগুলি স্নিগ্ধ প্রভাতের আলোয় যেন দুর্লভরত্নে ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। পৃথিবীর রূপকে ভাল লাগিল। জীবনসংগ্রামে ঘাত প্রতিঘাত ও দৈনন্দিন কঠোর কর্ত্তব্য সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিলাম। সান্ত্বনা পাইলাম—এই ভাবিয়া, সুন্দরের পূজার অর্ঘ্য সংগ্রহ করিয়াছি;—কিন্তু পূজার মন্ত্রে আন্তরিকতা আসে নাই। উহা দীক্ষার প্রথায় স্মৃতি হইতে আবৃত্ত হইয়াছে মাত্র। যেদিন সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বশক্তির প্রয়োগে স্বহস্তে গঠিত মূর্ত্তির মাঝে আমার আরাধ্য রূপকে খুঁজিয়া পাইব, সেইদিন বুঝিব আমি নিষ্কণ্টক। সেই দিন আমি সৃষ্টির আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিব। সমালোচকের স্তুতি অথবা নিন্দাবাদ সম্বন্ধে নির্লিপ্ত হইয়া যাইব। দৈন্য আমাকে পীড়িত করিবে না। যশোলিপ্সা কাম-চরিতার্থের ন্যায় ক্ষণিকের ভোগ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। আমি শিল্পী ও স্রষ্টা হইয়া বাঁচিব—ভবিষ্যতের চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিব না। বর্ত্তমানকেই আমার সাধনায় সব কিছু দিয়া দিব। কোন একদিন হয়ত ভবিষ্যৎ, অতীতের শিল্পীকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। তখন আমার কাজ বাঁচিয়া থাকিলেও, আমি সাধারণের নিকট প্রশংসাভিক্ষার জন্য এ জগতে থাকিব না।